থ্রি : টোয়েন্টিওয়ান এএম

3:21 AM

নিক পিরোগ

অনুবাদঃসালমান হক

আলেক্সান্দ্রিয়া থেকে ৩০০০ মাইল দূরে, আলাস্কার ফেয়ারব্যাংকসে জীবনের প্রথবারের মত সূর্য দেখতে গেল হেনরি বিনস, সাথে ল্যাসি আর প্রেমিকা ইনগ্রিড। কিন্তু দু-দিন পরেই কেঁপে উঠল পুরো ধরণী। ৮০০ লোকের মৃত্যু। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে গেল হেনরি বিনস–তারপর? নিক পিরোগের জনপ্রিয় 'হেনরি বিনস' সিরিজের তৃতীয় বইটি পাঠককে পরবর্তি বইটি পড়তে বাধ্য করবে।

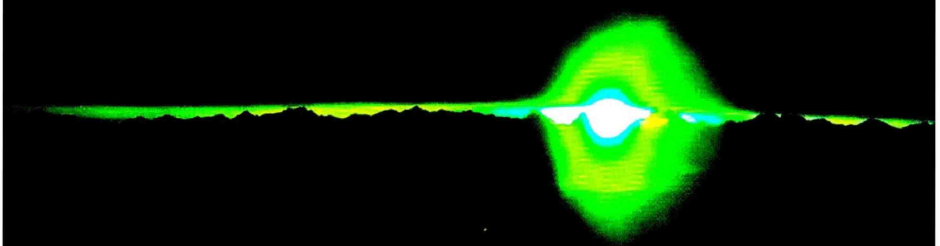

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 98487 992-

9 789848 729922

আমেরিকান ঔপন্যাসিক নিক পিরোগের জন্ম ১৯৮৪ সালে। পড়াশোনা করেছেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবসা প্রশাসনে। বেস্টসেলার ১১টি থ্রিলার উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। আমাজনে প্রতিটি উপন্যাসই অন্যতম বেস্টসেলার হিসেবে স্বীকৃত। হেনরি বিনস তার সৃষ্ট ব্যতিক্রমি একটি চরিত্র।
বর্তমানে তিনি আমেরিকার সান ডিয়েগোতে বসবাস করছেন।

সালমান হকের পৈতৃক নিবাস সিরাজগঞ্জে হলেও জন্ম ও বেড়ে ওঠা এই ঢাকা শহরে। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও রাজউক কলেজ থেকে পাশ করে বর্তমানে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে অণুজীববিজ্ঞান বিষয়ে অধ্যয়নরত আছেন। ছোটবেলা থেকেই বই পড়ার নেশায় আসক্ত, সেই থেকেই লেখালেখির শুরু। থ্রিলার গল্প-উপন্যাসের প্রতি আলাদা ঝোঁক রয়েছে তার।

নিক পিরোগের *থ্রি এ এম* তার প্রথম অনুবাদগ্রন্থ। *থ্রি : টেন এ এম* তার দ্বিতীয় অনুবাদ কর্ম।

জাপানি থ্রিলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনোর ***দ্য ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স*** তার অন্যতম জনপ্রিয় কাজ। খুব শীঘ্রই বাতিঘর প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে ***দ্য বয় ইন দি স্ট্রাইপড পায়জামাস*** উপন্যাসটি।

থ্রি: টোয়েন্টিওয়ান এএম

নিক পিরোগ

অনুবাদ : সালমান হক

বাতিঘর প্রকাশনী

থ্রি : টোয়েন্টিওয়ান এএম

মূল : নিক পিরোগ
অনুবাদ : সালমান হক
3:21 AM

Copyright © 2016 by Nick Pirog
অনুবাদস্বত্ব © বাতিঘর প্রকাশনী

প্রচ্ছদ : ডিলান

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টম্বর ২০১৬
প্রথম ডিজিটাল প্রকাশঃ সেপ্টম্বর ২০১৬
বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্সঃ ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : একশত টাকা মাত্র

উৎসর্গ :

চাচাআব্বুকে

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

অধ্যায় ১

১৮ই জুন
আলেক্সান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়া

ব্যাপারটা আমার প্রতিদিনকার রুটিনের অংশেই পরিণত হয়ে গেছে বলতে গেলে। মাঝে মাঝে শুধু নজর বুলাই, কিন্তু প্রায়ই খোলার উদ্দেশ্যে হাতে নিয়ে বসে থাকি। এভাবেই দুই তিন মিনিট চলে যায় প্রতিদিন। কিন্তু আমার জন্যে ঐ দুই তিন মিনিটই বিশাল ব্যাপার। কারণটা জানেন বোধহয়, প্রতিদিন আমার জন্যে মাত্র ষাট মিনিট বরাদ্দ থাকে। এই সময়টা হয়ত আমি ইনগ্রিডের সাথে কাটাতে পারতাম কিংবা ল্যাসির পেটে একটু হাত বুলিয়ে দিতে পারতাম। বাবার সাথে কার্ড খেলেও পার করা যেত সময়টা। মোটকথা আমার দৈনন্দিন জীবন থেকে মহামূল্যবান দুই-তিন মিনিট নষ্ট করছি প্রতিদিন।

কিন্তু খামটা খোলার সাহস হয় না। তাই এমুহূর্তে ভেতরের লেখা আর ছবিগুলো কল্পনা করা ছাড়া আর উপায় নেই কোন।

"আমাদের বেরুতে হবে এখন। এয়ারপোর্টে যেতে বিশ মিনিট লাগবে," ইনগ্রিডের গলার আওয়াজ ভেসে এলো লিভিং রুম থেকে।

ফোনের দিকে একবার তাকালাম।

তিনটা বত্রিশ।

পটোম্যাক এয়ারফিল্ড এখান থেকে দশ মাইলের মতন দূরে হবে, নদীর ওপারে। আমরা যদি চারটা বাজার আগেই ওখানে পৌছাই, তাহলে সবার জন্যেই সুবিধা। যদিও আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ইনগ্রিড আগে থেকেই একটা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করে রেখেছে।

যদি দরকার পড়ে!

"আসছি আমি," জবাব দিলাম। আমার দৃষ্টি এখনও লম্বা লাল খামটার ওপর। আলমারির মাঝখানের তাকে রাখা ওটা।

প্রায় আট মাস হয়ে গেছে প্রেসিডেন্ট সুলিভান আমাকে খামটা দিয়েছেন। দেবার সময় আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, "খামটা খোলার আগেই আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, ওখানে কিন্তু বেশ স্পর্শকাতর কিছু

ব্যাপার বলা আছে। একবার দেখে ফেললে আর মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন না ওগুলো।"

তিনি পড়েছেন ভেতরের লেখাগুলো। তিনি জানেন। জানেন, আমার মা আমাকে নিয়ে কি করেছেন।

কিন্তু আমি আসলে মা'কে নিয়ে চিন্তিত নই। আমার সব ভয় বাবাকে নিয়ে।

যদি সিআইএ'র প্রাক্তন পরিচালক লে'হাইয়ের কথা সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মা একজন নামকরা টর্চার স্পেশালিস্ট। জিজ্ঞাসাবাদের ধরণকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন তিনি অত্যাচারের মাধ্যমে। আর তার কারণেই আমার এই অদ্ভুত অসুখ (আমি হেনরি বিনস, আর আমি হেনরি বিনসে ভুগছি)। মাত্র ষাট মিনিট পাই আমি প্রতিদিন। তিনটা থেকে চারটা। আমার মা যখন আমার এই হাল করছিলেন তখন বাবা কোথায় ছিলেন?

আমি এখন জানি, আমার মা জীবিত। কিন্তু গত ত্রিশ বছর ধরে আমার সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। ভবিষ্যতে যোগাযোগ হবে সে সম্ভাবনাও ক্ষীণ। বাবা হচ্ছেন আমার জীবনের সবকিছু। তার জন্যেই আজকের এই আমি। এমন যদি হয়, বাবাও মা'কে ওকাজে সাহায্য করেছেন? গত ত্রিশ বছর ধরে কি ক্রমাগত মিথ্যে বলে যাচ্ছেন তিনি আমাকে?

"ওটা সঙ্গে নিও না।"

ঘুরে দাড়ালাম আমি।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে ইনগ্রিড। ওকে দেখে একটুও ক্লান্ত মনে হচ্ছে না, কিন্তু আমি জানি, গত সাতাশ ঘন্টায় সে একটুও ঘুমায়নি। নীল জিন্স আর ম্যারিল্যান্ড ইউনিভার্সিটির একটা টিশার্ট পরে আছে ও। পায়ে সাদা-নীল নাইকি। আমাকে গত রাতে প্যাকিঙে সাহায্য করার পরপরই ইনগ্রিড অফিসে চলে গেছিল। এর পরবর্তি বিশ ঘন্টায় সে দুটো কেস নিয়ে কাজ করেছে যাতে আগামি এক সপ্তাহের ছুটিটা নির্বিঘ্নে আমার সাথে কাটাতে পারে সে।

"সামনের সপ্তাহটা শুধু তোমার আর আমার," আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল ও।

মাথা নাড়লাম। ঠিকই বলেছে ইনগ্রিড।

গত সাত মাস ধরে আমরা একসাথে থাকলেও প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিন থেকে চারঘন্টা দেখা হয় আমাদের। ডিউটির সময়ের প্রতি ওর নিজের কোন হাত নেই। যেকোন সময়ে ছুটে যেতে হয়ে অফিসে। মাঝে মাঝে

একটানা তিনদিন চলে যায়, কিন্তু আমাদের দেখা সাক্ষাত হয় না। শুনতে যতটা কঠিন মনে হয় বাস্তবে আমাদের সম্পর্কটাতে পরস্পরের সাথে মানিয়ে চলা অনেক বেশি কঠিন। আর গত পনের মাসে আমাদের জীবনে যা ঘটেছে, জেসি ক্যালোমেটিক্সের খুনের রহস্য, সিআইএ পরিচালকের ষড়যন্ত্র, এসব কিছুর কারণে আমরা নিজেদের একান্ত সময় বলে কিছু পাইনি বলতে গেলে।

আলমারির পাল্লাটা বন্ধ করে তালা দিয়ে দিলাম।

"ঠিক বলেছ।"

"ভিভা মেক্সিকো," জবাবে হেসে বলল ও।

"আমরা আলাস্কা যাচ্ছি।"

"ওহ্! ভিভা আলাস্কা।"

ওকে কাছে টেনে নিয়ে লম্বা একটা চুমু খেলাম।

"চল এখন," আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ও। "তোমাকে ঠেলে ঠেলে প্লেনে ওঠানোর ইচ্ছে নেই আমার।"

হেসে দরজার দিকে রওনা দিলাম আমরা।

"ল্যাসি কোথায়?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বেচারাকে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছিল তখন। মনে হয় না সে যেতে চায় আমাদের সাথে। বরং তোমার বাবার ওখানে গিয়ে মারডকের সাথে সময় কাটানোর ইচ্ছে তার।"

ল্যাসির অবস্থা আসলেও সুবিধার মনে হচ্ছে না। ব্যাটা এখন রান্নাঘরের টেবিলের ওপর ঘাপটি মেরে বসে আছে। চোখ অর্ধেক বন্ধ।

"কীরে, কি সমস্যা তোর?"

মিয়াও।

"তোকে তো আগেই বললাম, মারডক অসুস্থ। ওকে সাথে নিলে কোন মজাই হবে না।" আসলে মারডক অসুস্থ না, কিন্তু আগামিকাল ওর অপারেশন। কিসের অপারেশন? শুনলে মজা পাবেন। গত কয়েকমাস ধরে ওর জ্বালায় বাবার বাসার আশেপাশের কুকুরগুলোর নাজেহাল অবস্থা (বিপরীত লিঙ্গের কুকুরের কথা বলছি)। অনেকেই অভিযোগ করেছে বাবার কাছে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পশু ডাক্তারের কাছে নিয়ে মারডকের ওপর ছুরি চালানো হবে। সোজা কথা, ওকে খোঁজা করা হবে। এ মুহূর্তে ল্যাসি সেখানে থাকলে তা কোনভাবেই সেটা সম্ভব না।

মিয়াও

"আমি জানি না কি অসুখ। সর্দি হতে পারে। আমরা ফিরে আসার পরে বাবার ওখানে এক মাস থাকিস, যাহ্।"

চোখ বড়বড় করে আমার দিকে তাকাল ব্যাটা।

"আলাস্কায় গিয়ে আমরা অনেক মজা করব।"

মিয়াও।

"না, কোন ইগলু ঘরে থাকতে যাচ্ছি না আমরা। ওখানেও এখন গ্রীষ্মকাল। খুব সুন্দর আবহাওয়া।"

মিয়াও।

"হরিণের পিঠে? যদি চড়তে পারিস তাহলে চড়বি! আমি বাধা দিব না। কিন্তু ফেয়ারব্যাঙ্কসে হরিণ আছে কিনা সন্দেহ।"

জোরে একবার নিঃশ্বাস ফেলল ও জবাবে।

"কিন্তু ওখানে কি আছে জানিস..." ল্যাপটপ খুলে একটা ফোল্ডার ওপেন করলাম। এর ভেতরেই গত এক মাস ধরে আলাস্কার বিভিন্ন জিনিসের ছবি জামাচ্ছি আমি। যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেতে বেশি দেরি হল না। ওটায় ক্লিক করে মনিটরটা ওর দিকে ঘুরিয়ে দিলাম। "মেরু শিয়াল।"

আগ্রহে চোখটা বড় বড় হয়ে গেল হারামিটার।

"যাহ্ এখন, গুছিয়ে ফেল সবকিছু।"

দশ সেকেন্ড পর ওর ঝুনঝুনি লাগানো বলটা মুখে নিয়ে দরজার সামনে তৈরি ল্যাসি।

3:21 AM

"আলাস্কা দেখার আগেই মরার শখ নেই আমার।"

ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেও পর মুহূর্তে হেসে ফেলল ইনগ্রিড। গাড়ির গতি কমিয়ে দিল অনেকটা। এতক্ষন ঝড়ের বেগে চালাচ্ছিল। তারপরও অতিরিক্ত তিন মিনিট হাতে থাকতে থাকতেই পটোম্যাক এয়ারফিল্ডে পৌছে গেলাম আমরা।

একটা লোক গলফ কার্ট নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। ব্যাগগুলো কার্টে উঠিয়েই টারমাকে দাঁড়িয়ে থাকা প্লেনটার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

এখন তিনটা আটান্ন বাজছে।

এই চার্টার্ড প্লেন আর ফেয়ারব্যাঙ্কসের সবচেয়ে বিলাসবহুল ক্যাবিনটা ভাড়া করতে কম খরচ হয়নি। কিন্তু স্টক মার্কেটে আমার বেশ ভালো সময়

গেছে গত কয়েক মাসে। তাই গায়ে লাগেনি অতটা।

প্লেনটার পাশে রাখা হুইলচেয়ারটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু লাগবে না ওটা।

কাঁটায় কাঁটায় তিনটা উনষাটে প্লেনের দরজার কাছে পৌছে গেল গলফ কার্টটা। আমরা তিনজন লাফিয়ে নেমে প্লেনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। মালপত্রগুলোর ব্যবস্থা লোকটা করবে। পাইলট আমাদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ল্যাসিকে একবার আদর করে দিল।

তাড়াতাড়ি প্লেনের ভেতরের বড় দুটো সিটে বসে পড়লাম আমরা। সব কিছু অন্ধকার হয়ে যাবার আগে ল্যাসি আমার কোলে উঠে পড়ল আর ইনগ্রিড আমার কপালে চুমু খেল একবার।

এরপর চোখ খুলব একদম আলাস্কায় গিয়ে।

সেই সঙ্গে তিনটা বেজে সাত মিনিটে জীবনে প্রথমবারের মত সূর্যটা দেখব আমি।

অধ্যায় ২

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
১৯ শে জুন
সূর্যোদয় : সকাল ৩:০৭
ফেয়ারব্যাঙ্কস, আলাস্কা

আর্কটিক সার্কেল থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কস ২০০ মাইল দক্ষিণে। আর্কটিক সার্কেল মূলত একটি কাল্পনিক রেখা যার দক্ষিণে সূর্য খুব বেশি সময়ের জন্যে অস্ত যায় না। বাইশ ঘন্টার মত দিনের আলো থাকে এখানে। বাকি দু-ঘন্টা সূর্য দেখা যায় না, কিছুটা অন্ধকার ভাব থাকে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছি। পুরো গা ঘামে ভিজে গেছে।

দুঃস্বপ্নের রেশটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

একটা সাদা ঘর।

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত একজন ডাক্তার।

আমার বাহুতে একটা আইভি লাগানো।

কোথায় ওটা?

আমি জানি না।

কোথায় ওটা?

কি কোথায়?

ফ্ল্যাশড্রাইভভটা।

কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভভ?

গোলাপি রঙের তরলে ভরা একটা সিরিঞ্জ।

আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

নলের মধ্যে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে চাপ দিল লোকটা।

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ঠিক এই সময়টাতেই ঘুম ভেঙে গেছে।

প্রায় এক মিনিট সময় নিলাম স্বাভাবিক হতে। কিন্তু খুব একটা সুবিধা করতে পারলাম না। কারণ এরকম অচেনা এক বিছানায়, অচেনা এক ঘরে স্বাভাবিক হওয়া অতটা সহজ নয়। আমি এর আগে ইন্টারনেটে অবশ্য

ঘরের ছবিটা দেখে রেখেছিলাম। কিন্তু তবুও মানিয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগবে মনে হচ্ছে। এই মাস্টার বেডরুমটাতে আছে বিশাল দামি কাঠের বিছানা। জানালাগুলো ভারি পর্দায় ঢাকা। পর্দাগুলো বাইরের সূর্যের আলো থেকে অতিথিদের রক্ষা করবে। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠবে সূর্য। এই ঘরটা ছাড়াও আরো দুটো ঘর আছে এই বিলাসবহুল কেবিনে। এখানে যখন পৌঁছুতে পেরেছি তার মানে সব কিছু নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়েছে। এগার ঘন্টার ফ্লাইট, এরপরে একটা হুইলচেয়ারে করে ভ্যানে ওঠা, সেইনা নদীর পার ধরে বিশ মিনিটের রাস্তা পাড়ি দিয়ে আমাকে এখানে এই বিছানায় শুইয়ে দেয়া–কোন কিছুতে ঝামেলা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না।

বিছানা থেকে নেমে জিন্স আর টি-শার্ট পরে নিলাম, ইনগ্রিড আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল এগুলো আমার জন্যে। এরপর বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে পানির ছিটা দিলাম। কিছুটা স্বস্তি লাগছে এখন। বাথরুম থেকে বের হয়ে জুতোটা পরে নিলাম।

ব্যাকনের সুস্বাদু গন্ধ এসে নাকে লাগল। পা বাড়ালাম ওদিকে।

"ঘুম ভাঙল তাহলে," রান্নাঘর থেকে আমার উদ্দেশ্যে বলল ইনগ্রিড।

"শুভ সকাল," জবাব দিলাম।

"ঠিক আছ তুমি?" ঘাড়টা একদিকে কাত করে আমাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"হ্যা, একদম।"

দুঃস্বপ্নটার ব্যাপারে ওকে বলতে চাই না আমি। এটা জানাতে চাচ্ছি না যে, গত কয়েকমাস ধরেই প্রতিরাতে দুঃস্বপ্ন দেখছি আমি। আমাকে ওভাবে বেধে রেখে টর্চার করার পর থেকে শুরু এই ঘটনা।

ল্যাসি একটা মার্বেলের টেবিলের ওপর বসে বসে ইনগ্রিডের তৈরি করা ব্যাকন আর ডিম খাচ্ছে। ওকে একটু আদর করে ইনগ্রিডকে কাছে টেনে নিলাম। কিছুক্ষণ আমার চেহারার দিকে একটানা তাকিয়ে থাকল ও, আমি মিথ্যা বলছি নাকি পরীক্ষা করে দেখছে। একটু পর গালে একটা চুমু খেয়ে বলল, "তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নাও এবার।"

একটা ব্যাকন মুখে পুরে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। আসলেও অনেক বড় কেবিনটা। জায়গায় জায়গায় দামি কাঠ দিয়ে নকশা করা। একটা বিলাসবহুল কেবিন, যার সাপ্তাহিক ভাড়া চার হাজার ডলার হিসেবে যা যা থাকা দরকার, তার সবই আছে। ফ্ল্যাটস্ক্রিন টিভি, অ্যান্টিক ছবি, ক্রিস্টালের ফুলদানি–কোনকিছুরই কমতি নেই। চারটা জানালা দিয়ে

বাইরের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ দেখা যাচ্ছে।

সূর্য উঠতে আর চার মিনিট বাকি।

ল্যাসি তার নিজের ভাগের নাস্তা শেষ করে কাতর চোখে আমার প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে। একটা ব্যাকন ওর প্লেটের দিকে ছুড়ে দিতেই লাফিয়ে পড়ল ওটার ওপর।

"কি করলে তোমরা দু'জন এতক্ষন?" জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে ইনগ্রিড কালকে আমি ঘুমিয়ে যাবার পর থেকে সব কিছু খুলে বলা শুরু করল। ফেয়ারব্যাঙ্কস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে আমরা ল্যান্ড করেছি এখানকার স্থানীয় সময় বেলা সাড়ে এগারোটায়। ভার্জিনিয়ায় তখন বাজছিল সাড়ে তিনটার মত। প্রায় এগার ঘন্টার ফ্লাইট। এর চল্লিশ মিনিট পরে আমরা এই কেবিনে পৌছাই। আমাকে এখানে শুইয়ে রেখে ইনগ্রিড আর ল্যাসি বের হয়েছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের মূল শহরতলি ঘুরে দেখতে। এখান থেকে মাত্র এক মাইলের মত দূরে হবে জায়গাটা। ওখান থেকে বাজার করে কেবিনে ফিরে রান্না সেরে সাড়ে নয়টার দিকে ঘুমুতে যায় দু'জনই। এই এক ঘন্টা আগে ঘুম থেকে উঠেছে ইনগ্রিড।

"তো, আজকের মেনুতে আর কি আছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ওটা সারপ্রাইজ," মাথা নেড়ে জবাব দিল সে।

ফ্রিজের উদ্দেশ্যে আশেপাশে তাকালাম। কিন্তু সব জায়গায় খালি মোটা ওক কাঠের নকশা। ইনগ্রিড ওরকম একটা কাঠের পাল্লা খুলতেই জিনিসপত্রে ঠাসা ফ্রিজটা চোখে পড়ল। ওখান থেকে একটা জুসের বোতল নিয়ে আমার দিকে ছুড়ে মারল ও।

"এটার রঙ সবুজ কেন?" বোতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"ইসাবেলের রেসিপির সাথে অল্প একটু বাঁধাকপি যোগ করে দিয়েছি আমি।"

ইসাবেল হচ্ছে আমার বাসার কেয়ারটেকার-কাম-রাঁধুনি। আমার জন্যে জুস বানানো বাদেও আমি অন্য যা যা খাই সবই তৈরি করে রাখে সে। আমার একঘন্টা সময়টাকে যেন সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারি সেদিকেও তার সমান খেয়াল। এই যেমন ঘুম থেকেই উঠেই দেখব, ব্রাশে টুথপেস্ট লাগানো আছে, কিংবা দৌড়ানোর জুতোজোড়া দরজার সামনে করে রাখা আছে মোজাসহ।

জুসের বোতলে এক চুমুক দিয়েই নাক কুঁচকে ফেললাম।

"এই তোমার 'অল্প একটু'?"

"আচ্ছা বাবা, একটু না-হয় বেশিই যোগ করেছি। কিন্তু তোমার শরীরের জন্যে ওটুকু দরকার আছে।"

গত প্রায় এক মাস ধরে ইনগ্রিড আমার শরীরের প্রতি একটু বেশিই নজর রাখছে। যেহেতু আমি দিনে তেইশ ঘন্টার মত ঘুমাই, তাই তার ধারণা আমি দরকারের চেয়ে অনেক কম পরিমাণে পানি পান করি। খাওয়াদাওয়ার পরিমাণও নাকি যথেষ্ট কম। ইদানিং তাই ঘুম থেকে উঠেই এক বোতল পানি (সাথে অবশ্যই স্বাস্থ্যকর কিছু মেশানো থাকে), একটা এনার্জি বার আর ভিটামিন ট্যাবলেট গিলতে হয় আমাকে।

এত দিন এই 'মধুর' অত্যাচার চোখ বুজেই সহ্য করেছি, কিন্তু আজকে বাঁধাকপির জুসটা একটু অতিরিক্তই হয়ে গেছে।

"লক্ষ্মি ছেলের মত তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো ওটা," হাতঘড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে বলল ইনগ্রিড, "যেতে হবে আমাদের।"

নাক বন্ধ করে গিলে ফেললাম জিনিসটা। এরপর বোতলটা সিঙ্কে রেখে দিলাম।

"এবার আসো আমার সাথে," একটু জোরেই বলল কথাটা ইনগ্রিড।

তিনটা পাঁচ বাজছে এখন।

ওকে অনুসরণ করে পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়লাম। একটা স্প্রে ক্যান হাতে নিয়ে আমার সারা শরীরে স্প্রে করল ইনগ্রিড। মশাদের দূরে রাখবে এটা। গ্রীষ্মকালে আলাস্কায় মশার উৎপাত বেড়ে যায় বহুগুণে। আমিও ওর গায়ে স্প্রে করে দিলাম।

এরপর আমাকে নিয়ে লিভিংরুমে চলে এলো সে। একটা কাঁচের স্লাইডিং দরজা খুলে বারান্দায় ঢুকে পড়লাম আমরা।

ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

বারান্দাটা সেইনা নদীর একদম পাশেই। সামনে তাকালে প্রায় দুইশ ফিট চওড়া নদীটা একদম পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। নদীর তীর ঘেঁষে হাজার হাজার সবুজ রঙের গাছের সমারোহ। আর সেই সবুজের সমুদ্রের ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে লাল আর কমলা রঙের আকাশ।

বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছি।

দীর্ঘ একটা মিনিট ওভাবেই কেটে গেল।

"সময় হয়ে গেছে," আমাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল ইনগ্রিড।

আর তারপরই চোখে পড়ল ওটা।

এক টুকরা ছোট্ট তীব্র সাদার ঝলকানি।

সূর্য।

"কখনো ভাবিনি এই দৃশ্য দেখব আমি," প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে বললাম কথাগুলো।

এরপরের বিশ মিনিট এক রকম ঘোরের মধ্যে থেকে জীবনে প্রথমবারের মত সূর্যোদয় দেখলাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে দিগন্তে বেরিয়ে এল সেটা। একসময় নদীর পানির একদম সমান্তরালে এসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে দিলাম ওদিকে। রশ্মিগুলো যেন অনুভব করতে পারছি।

"আসো, বসো এখানে,।"

আমি এতক্ষণে খেয়ালই করিনি, ইনগ্রিড মাঝে কিছু সময়ের জন্যে উধাও হয়ে গিয়েছিল এখান থেকে। ঘুরে তাকিয়ে দেখি দুটো চেয়ার আর প্লেটভর্তি খাবার সাজিয়ে ফেলেছে সে।

আমার চোখের কোণে পানি ওর নজরে পড়লেও সেটা নিয়ে কোন মন্তব্য করল না।

একটা ছোট প্লেটে ল্যাসির জন্যে খাবার বেড়ে দিল ইনগ্রিড। এরপর তিনজনই চুপচাপ খেতে লাগলাম।

তিনটা আটান্নর সময় ইনগ্রিডের ক্রিসমাসে উপহার দেয়া হাতঘড়িতে অ্যালার্ম বেজে উঠল।

"ভেতরে গিয়ে শুয়ে পড়া উচিত তোমার এখন।"

"আজকে এখানেই ঘুমাব আমি," ওর উদ্দেশ্যে বললাম আমি। "সূর্যের আলোয়।"

অধ্যায় ৩

বাংলাবুক্‌স ডিরেক্ট লিঙ্ক
২০ শে জুন
সূর্যোদয়–৩:০৭

"আউচ," চিৎকার করে উঠলাম, একদম জ্বলে যাচ্ছে জায়গাটা।

"বাচ্চা না তুমি, চেঁচানো বন্ধ করো," আমার মুখের চারপাশে আর ঘাড়ে আরেক পরত অ্যালোভেরা জেল লাগাতে লাগাতে বলল ইনগ্রিড।

"আমার জায়গায় তুমি হলে বুঝতে, তোমার চেহারা তো আর জ্বলে যায়নি।"

"আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, তুমি কোন সানস্ক্রিম লাগানো ছাড়াই বারান্দায় গিয়েছিলে।"

"আর আমিও বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার মাথায় এটা আসলো না যে ছয়ঘন্টা ওভাবে বাইরে বসে থাকলে আমার চেহারা টমেটোর মতো লাল হয়ে যাবে।"

"বললামই তো, আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আর তাপমাত্রা যে পঁচাশি ডিগ্রিতে উঠে যাবে এটাও জানা ছিল না আমার। হাজার হোক এটা আলাস্কা! এখানে তো ঠান্ডা হবার কথা!"

"আমি তো আগেই সাবধান করেছিলাম গরমের ব্যাপারে," এখানে আসার আগের দিন আবহাওয়ার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছিলাম আমি। ঐ বার্তায় বলা হয়েছিল আগামি দশদিন তাপামাত্রা থাকবে আশির ঘরে।

"আমি তো ভেবেছিলাম এখানকার গরম মানে চল্লিশ ডিগ্রির আশেপাশে।"

"এক মিনিট!" ওকে থামিয়ে বললাম আমি, "তুমিও যদি বাইরে ঘুমিয়ে পড়ো, তাহলে তোমার চেহারা এমন বহাল তবিয়তে আছে কিভাবে?"

"আমি সানস্ক্রিম লাগিয়ে নিয়েছিলাম," চোরের মত গলায় বলল ও।

হতাশ হয়ে মাথা নাড়লাম আমি। আসলেই বোকার মত কাজ হয়েছে সানস্ক্রিম না লাগিয়ে।

"তোমাকে একটা ভেজা তোয়ালে এনে দিচ্ছি আমি," এই বলে ভেতরে উধাও হয়ে গেল ইনগ্রিড।

কিছুক্ষণ পরে ল্যাসি হেলে-দুলে ঢুকল বাথরুমে। কিন্তু আমাকে দেখেই পিছিয়ে গেল।

"আরে, এটা সানবার্ন।"

মিয়াও।

"না, ইবোলা না এটা।"

মিয়াও।

"কারণ গত কয়েকমাসে আফ্রিকায় যাইনি আমি।"

মিয়াও।

"বললাম না সানবার্ন! সূর্যের নিচে অনেকক্ষণ থাকলে এমনটা হয়!"

মিয়াও।

"তোর হয়নি কারণ তোর গায়ে লোম ভর্তি।"

মিয়াও।

"কারণ মানুষের বুদ্ধি বিড়ালের চেয়ে বেশি। আর বেশি বুদ্ধির প্রাণীদের শরীরে লোম একটু কমই থাকে।"

মিয়াও।

"আমাকে কার মত দেখা যাচ্ছে?"

মিয়াও।

"এই ফ্রেডি ক্রুগারটা আবার কে?"

"চলে আসো," ভেতর থেকে ইনগ্রিড বলল। "খাবার তৈরি।"

ল্যাসি একলাফে বাথরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

ফোনটা হাতে নিয়ে বাবাকে একটা মেসেজ করে বলে দিলাম, এখানে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। আমার কল্পনার চেয়েও আসল সূর্য অনেক বেশি সুন্দর। মারডক কেমন আছে সেটাও জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুক্ষণ পরে আমার ফোনে মারডকের একটা ছবি পাঠাল বাবা। কাউচে শুয়ে ক্যামেরার দিকে ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। ছবির নিচে লিখে দিয়েছে বাবা "ও জানে ওর সাথে কি করা হয়েছে।"

একবার ভাবলাম ছবিটা ল্যাসিকে দেখাই, কিন্তু পরমুহূর্তেই বাতিল করে দিলাম চিন্তাটা।

আয়নায় তাকিয়ে একবার নিজের চেহারায় না নজর বুলিয়ে পারলাম না। আমার বাদামি চোখের চারপাশটা গাঢ় লাল হয়ে আছে। তার ওপরে সবুজ সবুজ জেলের পরত। মাথা নেড়ে বারান্দার উদ্দ্যেশ্যে হাটা শুরু করলাম।

একটা বড় প্লেটে স্যান্ডউইচ সাজিয়ে রেখেছে ইনগ্রিড। সাথে সবুজ রঙের জুস, লেমোনেড আর ক্যারামেল কর্ন। এসবকিছুই একটা সুন্দর পিকনিক টেবিলের ওপর রাখা। ছাতাও জুড়ে দিয়েছে ও।

"তোমার উচিত সূর্যের থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখা," আমার ঘাড়ের চারপাশে একটা ভেজা কাপড় জড়িয়ে দিতে দিতে বলল ইনগ্রিড। "টমেটো মানব।"

দু'জনেই হেসে উঠলাম আমরা। "ফ্রেডি ক্রুগারটা কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কেন?"

"ল্যাসি বলল আমাকে নাকি ফ্রেডি ক্রুগারের মত দেখাচ্ছে।"

"তাই নাকি?" এই বলে ল্যাসির দিকে একবার নজর দিল ইনগ্রিড। সে এখন সকালের নাস্তা পরবর্তি নিদ্রায় মগ্ন। "ফ্রেডি ক্রুগার হচ্ছে *নাইটমেয়ার অন এল্‌ম স্ট্রিট* নামের হরর মুভির একটি চরিত্র। তার চেহারা পুরোপুরি ঝলসে যাওয়া। স্বপ্নে হানা দেয় সে, আর ওখানে যদি তার হাতে তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে বাস্তবেও মৃত্যু হবে।"

"তার মানে, ওসব সিনেমায় সহজে কেউ ঘুমোতে চায় না?"

"না।"

"আমার মত।"

"ফ্রেডি ক্রুগারের কিন্তু কোন সুন্দরি গার্লফ্রেন্ড নেই।"

"ওহ, তাও ঠিক," হেসে বললাম আমি।

দীর্ঘ একটা চুমুর পর দু'জনে হাত ধরে সূর্যোদয় উপভোগ করতে লাগলাম।

3:21 AM

পনের মিনিট পরে আমাদের সামনে দিয়ে দুটো ক্যানো আর তিনটা কায়াক নৌকা ভেসে গেল। ওগুলোর আরোহিরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লে আমরাও পাল্টা হাত নাড়লাম।

"আমাদেরও ওরকম একটা ক্যানো নিয়ে নদীতে নেমে পড়া উচিত আগামিকাল," ইনগ্রিড বলল।

"আমি ইতিমধ্যেই ব্যবস্থা করে রেখেছি," হেসে জবাব দিলাম। "নদীতে অন্তত তিন থেকে চার জায়গায় ক্যানো নিয়ে নামা যায়। এখানে সচরাচর এরকম গরম পড়ে না, কিন্তু যখন পড়ে তখন নদীতে নেমে পড়ে

সবাই ক্যানো নিয়ে। পুরো জায়গাটা ক্যানোতে করে ঘুরে দেখতে চারঘন্টার মত সময় লাগে। কিন্তু আমরা কেবল শেষ দু'মাইল ঘুরব।

"আমি সানস্ক্রিম আগে থেকেই ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখব," আমার পায়ে আলতো চাপড় মেরে বলল ও। "ফ্রেডি।"

এরকম হালকা খুনসুটি আরো কিছুক্ষণ চালিয়ে গেলাম আমরা।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় আমার মনে হল, একটা ছোট সারপ্রাইজের বন্দোবস্ত করেছিলাম আমি।

"এখনই আসছি, দাঁড়াও," ইনগ্রিডের মাথায় হালকা চুমু খেয়ে উঠে দাঁড়ালাম। "ডিনারের পরে ডেজার্টের ব্যবস্থা করেছি আমি।"

এখানে আসার আগে দামি এক বোতল স্কচ হুইস্কি উপহার দিয়েছে বাবা। স্যুটকেস হাতড়িয়ে বেয়াল্লিশ বছরের পুরনো *গ্লেনফিডিচ*-এর বোতলটা বের করলাম। রান্নাঘর থেকে দুটো টাম্বলার গ্লাস নিয়ে বারান্দায় ফেরত আসলাম আমি।

গ্লাস দুটোতে অল্প করে হুইস্কি ঢেলে একটা ইনগ্রিডের দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু ওটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল না সে। এসময় আমার হাতের ঘড়িটা বেজে উঠল। আর দু'মিনিট আছে।

"কি হল?" জিজ্ঞেস করলাম। "তোমার স্কচ ভালো লাগে না?"

এবার আস্তে করে গ্লাসটা নিল ও।

"ইচ্ছে না করলে জোর করে খাওয়ার দরকার নেই।"

জবাবে মাথা ঝাঁকালো ও। এরপরে যখন আমার দিকে তাকালো তখন দুই চোখে পানি টলমল করছে।

"হেনরি," মৃদু স্বরে বলল ও, "আমি প্রেগন্যান্ট।"

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

অধ্যায় ৪

সূর্যোদয়–৩:০৭

আমি যখন রান্নাঘরে ঢুকলাম তখন ঘড়িতে বাজছে তিনটা দুই। ইনগ্রিড টেবিলের ওপর বসে, হাতে একটা ধোঁয়া ওঠা কফির মগ। আমার দিকে নীরব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, আমি কি বলি শোনার অপেক্ষায়।

"তুমি তো বলেছিলে বার্থকন্ট্রোল পিল নিচ্ছো।"

"নিচ্ছি," সায় জানিয়ে বলল ও।

"আসলেই নিচ্ছিলে?"

"প্রায় প্রতিদিনই।"

"প্রায়?"

"মাঝে মাঝে কাজের চাপে ভুলে গেছি।"

"কতদিন? কতদিন ধরে জানো তুমি ব্যাপারটা?"

"এক মাস।"

"এক মাস?"

"আমি একদম নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম।"

"আর এখন তুমি নিশ্চিত?"

ফুঁপিয়ে উঠে মাথা নেড়ে সায় জানালো ও।

লম্বা করে একবার শ্বাস নিলাম, এরপর বললাম, "আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি বাচ্চাকাচ্চা চাই না। বলেছিলাম না আমাদের খুবই সাবধান থাকতে হবে এ ব্যাপারে?" আসলে ব্যাপারটা এমন না যে, আমি বাচ্চাকাচ্চা চাই না। বাচ্চাকাচ্চা ভালোই লাগে আমার কিংবা বলা যায় ওদের ব্যাপারে ভাবতে খারাপ লাগে না। কিন্তু আমি আমার এই অবস্থায় বাবা হতে চাই না। একটা বাচ্চাকে কিভাবে বড় করবো আমি, যেখানে আমার জন্যে সারাদিনে মাত্র এক ঘন্টা বরাদ্দ থাকে? "আমি দিনে মাত্র এক ঘন্টা জাগি!" চিৎকার করে বললাম। "এটা কি মাথায় ঢোকে না তোমার? মাত্র ষাট মিনিট! আর এখন আমাকে একটা বাচ্চার ভরণপোষণ করতে হবে?"

ঘুরে দাঁড়ালাম। ওর চেহারাও দেখতে চাই না আমি। আসলে চাই না আমার কথাগুলো শুনে ওর কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা দেখতে। বেডরুমে ঢুকে

জিন্সের প্যান্টটা খুলে একটা ট্রাউজার পরে নিলাম। একটা হুডি গায়ে চাপিয়ে দৌড়ানোর জুতোজোড়া খুঁজে বের করলাম।

জুতোর ফিতে বাধা ল্যাসিকে হাত গিয়ে গুঁতো দিলাম। এখনও ঘুমোচ্ছে ও।

"ওই ওঠ্! চল্ আমার সাথে।"

দ্রুত একবার আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে গেল ও।

এক মিনিট পরে, সূর্যের আলোয় গাছগাছালির ভেতর দিয়ে দৌড়াতে লাগলাম আমি আর ল্যাসি। গন্তব্য ফেয়ারব্যাঙ্কস এর শহরতলী।

3:21 AM

জগিং ট্রেইলটা আমাদের ফেয়ারব্যাঙ্কসের একটা ছোট রাস্তায় নিয়ে আসলো। মূল শহরতলী থেকে দুই ব্লক দূরে। শক্ত কংক্রিটের রাস্তা ধরে সামনে এগোতে লাগলাম। পাশে ল্যাসি।

আমার চেহারায় যেন আগুন ধরে গেছে। রাগে আর কালকের সানবার্নের কল্যাণে। শেষ কবে এতটা রেগে গিয়েছিলাম মনে পড়ছে না। আমার সাথে কিভাবে করতে পারল ও এটা? এতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন হল কিভাবে?

প্রেগন্যান্ট!

এখন কি আমাকে আমার প্রতিদিনের একঘন্টা ডায়পার বদলাতে বদলাতে কাটাতে হবে?

সেইনা নদীর পার ধরে শহরতলীর দিকে এগোতে লাগলাম। ছবিতে জায়গাটা যতটা সুন্দর লেগেছিল এখন আর অতটা ভালো লাগছে না। কেমন যেন শিল্পাঞ্চল বলে মনে হচ্ছে। চারিদিকে কেবল লম্বা লম্বা বিল্ডিং। একটা ষাট ফুট লম্বা চৌকোণো বিল্ডিং পাশ কাটালাম। ওটায় সোনালি রঙের একটা ব্যানার ঝুলছে। ব্যানারে একটা মেরু ভাল্লুক আর ছয়টা রিং।

প্রতি গ্রীষ্মে ফেয়ারব্যাঙ্কসে অলিম্পিক আয়োজন করা হয়।

এস্কিমো-ইন্ডিয়ান অলিম্পিকস।

প্রতিবছর প্রায় দু'হাজার লোক জমা হয় এখানে অলিম্পিক উপলক্ষে। খেলাগুলোও অদ্ভুত। কান টানা প্রতিযোগিতা, সিল মাছ ধরা, কম্বল ছোড়া প্রতিযোগিতা, এগুলো হচ্ছে তুলনামূলক স্বাভাবিকগুলোর নাম। কাল ভোরে সূর্যোদয়ের সময় উদ্বোধনি অনুষ্ঠান। আমি দ্বিতীয় দিনের টিকেট কিনে রেখেছিলাম। আশা করেছিলাম ইনগ্রিডের সাথে কোন একটা খেলা হয়ত একসাথে উপভোগ করব।

প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনের একটা দল বাইরে খেলার বুথের কাজ করছে।

দুই ব্লক পার হয়ে কুশম্যান ব্রিজের কাছে পৌছে গেলাম। এখানে নদীটা চওড়ায় আমাদের কেবিনের বাইরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ব্রিজটা সোয়া মাইলের মত লম্বা। পটোম্যাক নদীর ব্রিজটার উপরে দাঁড়িয়ে যেদিন আমার মায়ের মৃত্যুর কথা ভেবেছিলাম তার পরে এটাই আমার দেখা প্রথম ব্রিজ। মনে আছে সেদিন কল্পনা করেছিলাম মা ব্রিজ থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। ভেবেছিলাম হয়ত আমাকে ওভাবে একা ফেলে চলে যাওয়ার অনুতাপ থেকেই কাজটা করেছেন তিনি। বাবার বলা একটা কথা মনে পড়ে গেল।

"ক্ষতি ওরই হয়েছে, আমাদের না।"

আমার বর্তমান অবস্থা কি মা'র থেকে খুব একটা ভিন্ন। হ্যা, আমার বাচ্চাটার আকার এখন হয়ত আমার আঙুলের নখের সমান। কিন্তু আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে ইনগ্রিড হয়ত আমাদের বাচ্চাকে বলবে, "ক্ষতি ওরই হয়েছে, আমাদের না।"

অবশ্য নদী থেকে যার লাশ পাওয়া গেছিল সেটা আমার মা'র ছিল না। তিনি এখনো জীবিত। বরং গত কয়েকমাসের ঘটনা থেকে যা বুঝতে পেরেছি, আমাদের ফেলে চলে যাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ কাজ করেছেন তিনি। কিন্তু এখনকার ব্যাপারটার সাথে আমার মা জড়িত নন। এটা আমার আর ইনগ্রিডের ব্যাপার। আর আমাদের সন্তানের।

ল্যাসি আর আমি ব্রিজের উপর উঠে মাঝামাঝি পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখান থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসকে অনেকটা বেশি রঙিন মনে হচ্ছে। পুরো ব্রিজটা রূপালি রঙের লাঠি দিয়ে সাজানো হয়েছে। লাঠিগুলোর মাথায় অলিম্পিকের চিহ্ন আঁকানো হলুদ রঙের পতাকা। একেকটা পতাকা একেকটা খেলার প্রতীক। আমার সবচেয়ে কাছে যেটা আছে সেটায় দু'জন লোককে দেখা যাচ্ছে। একটা রাবার ব্যান্ড দু'জনের কানে জড়ানো। এটাই বোধহয় বিখ্যাত কান টানা প্রতিযোগিতা।

ব্রিজের রেলিং থেকে অনেকগুলো ফুলদানি ঝুলছে। নানা রঙের ফুলে ভর্তি ওগুলো। ব্রিজটা যেখানে শেষ হয়েছে তার সামনের মোড়ে দুটো বহুতল হোটেল। একটার নাম হোটেল র‍্যাডিসন, তবে ওটার প্রতিযোগি হোটেলের নামটা বুঝতে পারলাম না। পার্কিংলটগুলো গাড়িতে ভর্তি। অলিম্পিকের কারণে হয়ত।

নদীর পাড়ে গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে সূর্য দেখা যাচ্ছে। পানিতে ইঞ্চি ইঞ্চি করে ওটার প্রতিফলনের আকার বাড়ছে।

ল্যাসি আমার পাশে কংক্রিটের ওপরেই শুয়ে পড়ল। ও জানে কখন আমাকে থাকতে দিতে হয়।

ইনগ্রিডের কথা ভাবছি, কেবিনে ওর এখনকার অবস্থার কথা। একা, ভীত আর অবশ্যই হৃদয় ভেঙে চৌচিড়।

"আমি একটা গাধা," নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম। মনে হল এক মিনিটের মধ্যে ইনগ্রিডের পাশে ছুটে যাই। ওকে বলি কতটা দুঃখিত আমি।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা একুশ বাজে।

"চল," ল্যাসির দিকে তাকিয়ে বললাম। কিন্তু ও মাথা নেড়ে না করে দিল, বেশি ক্লান্ত। আমি নিচু হয়ে তুলে নিলাম ওকে।

পায়ের নিচে কংক্রিটে কাঁপুনি অনুভব করাতে পেছনের দিকে ঘুরে তাকালাম। ভেবেছিলাম বড়সড় কোন ট্রাকের দেখা পাব কিন্তু একটা গাড়িও চোখে পড়ল না।

আবার কেঁপে উঠল ব্রিজটা। এবার বেশ জোরে। এতটা জোরে যে রেলিং ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে বাধ্য হলাম।

"কি হল এটা!" ল্যাসিকে এক হাতে শক্ত করে ধরে আর আরেক হাতে রেলিং ধরে জিজ্ঞেস করলাম।

মিয়াও।

"আমিও জানি না।"

এরপর আরো ভয়ঙ্করভাবে দুলে উঠলো ব্রিজটা। তাল সামলাতে না পেরে হাঁটুগেড়ে বসে পড়লাম। রেলিং থেকে একটা ফুলের টব বিশ ফিট নিচে পানিতে পড়ে গেল। রাস্তার মাঝামাঝি চলে গেলাম।

"ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!"

এখানে আসার আগে আলাস্কা সম্পর্কে রিসার্চ করার সময় একটা পরিসংখ্যান চোখে পড়েছিল। আমেরিকায় প্রতি বছর যতগুলো ভূমিকম্প সংঘটিত হয় তার অন্তত অর্ধেক হয় এই আলাস্কায়। কিন্তু আলাস্কার জনসংখ্যা একদমই কম হওয়াতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সব সময়ই নগণ্য হয়ে থাকে।

আমার বামপাশে র‍্যাডিসন হোটেলটা বিপজ্জনকভাবে দুলছে। এটা যদি ভেঙে পড়ে তবে ফলাফল ভয়ঙ্কর হবে, অনেক লোক মারা যাবে।

আবার দুলে উঠল ব্রিজটা। ল্যাসিকে এখন ধরে রেখেছি এক হাতে। তীরের অনেকগুলো গাছ শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নদীতে পড়ে গেল।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন পায়ের নিচের কংক্রিটের রাস্তাটাকে প্রচন্ড জোরে ঝাঁকাচ্ছে। ভয়ানক একটা আওয়াজ ভেসে আসল এসময় আমার পঞ্চাশ ফিট পেছন থেকে। ঘুরে দেখি ব্রিজের বড় একটা অংশ ভেঙে নদীতে পড়ে যাচ্ছে। সদ্য তৈরি হওয়া ত্রিশ ফিটের ফাঁকা জায়াগাটার দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলাম।

খুব সাবধানে উঠে দাঁড়ালাম। যেভাবেই হোক ব্রিজ থেকে নেমে যেতে হবে। আমার একদম ডানপাশের খুঁটিটা এসময় পতাকাসমেত পানিতে পড়ে গেল ভেঙে। গড়ান দিয়ে ওখান থেকে সরে গেলাম। তাড়াহুড়োয় হাত থেকে ছুটে লাফ দিয়ে আমার ঘাড়ে উঠে গেল ল্যাসি। হুডির ওপর দিয়েও ওর নখের আঁচড় বুঝতে পারলাম। আরেকটা খুঁটি পড়ে গেল। মনে হচ্ছে যেকোন সময় পুরো ব্রিজটাই ধ্বসে পড়বে।

এসময় শহরের দিক থেকে একটা ধুলোর কুণ্ডলি উড়তে দেখলাম, সাথে ভয়ানক আওয়াজ। একটা বিল্ডিং ধ্বসে পড়েছে। ভেতরে কতজন মানুষ আছে, কতজন মানুষ মারা গেল কে জানে।

ঐ ধুলোর কুণ্ডলির দিকেই রওনা দিলাম। কিন্তু আমার সামনের ব্রিজের অংশটুকুও ধ্বসে পড়ল এ সময়। লাফিয়ে পেছনে সরে এলাম। পাশের রেলিঙটা কোনমতে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। এখন দুটো বড় ফাঁকা জায়গার একদম মাঝখানে, যেখানে দ্বীপের মত টিকে আছে ব্রিজের ভাঙা অংশটুকু।

আমার ঠিক নিচে নদীতে বড় বড় ঢেউ চোখে পড়ল। কাঁপুনি থেমে গেলে এসময়। বড় করে একবার শ্বাস নিলাম।

"ল্যাসি!"

মিয়াও।

ও আমার দু'পায়ের মাঝে কাঁপছে থরথর করে। তুলে নিলাম ওকে। একহাত রেলিঙে রেখে সাবধানে চারপাশে তাকালাম। বিশ কদম পেছনে একটা ত্রিশ ফিটের ফাঁটল সৃষ্টি হয়েছে, যেখানকার অংশটুকু নদীতে তলিয়ে গেছে। দশ কদম সামনেও ব্রিজের বড় একটা অংশ উধাও। যে বিশটি খুঁটি লাগানো হয়েছিল সমগ্র ব্রিজ জুড়ে, ওগুলোর মধ্যে কেবল দুটো টিকে আছে এখন। কোনটার মাথাতেই পতাকা লাগানো নেই। ধুলোর কুণ্ডলির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো হোটেলই মাটির সাথে মিশে গেছে। সাথে আশেপাশের বিল্ডিংগুলোও।

কেবল একটা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে। আর কতগুলো বিল্ডিং ধ্বসে

পড়েছে চিন্তা করলাম। মৃতের সংখ্যা নিশ্চয়ই কয়েকশো ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এ মুহূর্তে কেবল একজনের কথাই মাথায় ঘুরছে আমার।

ইনগ্রিড।

আমাদের কেবিনটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে তো? ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে ও কি যথেষ্ট দূরে ছিল? যদি কেবিনটা ধ্বসে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ও কি চাপা পড়েছে? অসহায়ভাবে আমাকে ডাকছে?

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা একুশ বাজছে। প্রায় দু'মিনিট ধরে ভূমিকম্প হয়েছে।

আমি সামনের দিকে এগোলাম, ভেবেছিলাম যেখানে ত্রিশ ফিটের ফাঁটল সৃষ্টি হয়েছে তার নিচের দিকে কিছুটা অংশ হলেও ঝুলে থাকবে, যার ওপর লাফিয়ে নামব। কিন্তু ফুলে ফেপে ওঠা নদীর স্রোত ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না।

পেছনে গিয়ে দেখি সেখানেও একই অবস্থা।

মিয়াও।

"না, লাফ দিতে পারব না আমি।"

মিয়াও।

"আমি কার্ল লুইস না!"

আবার নদীর দিকে তাকালাম। ভূমিকম্পে কোন বাধ ভেঙে গেছে কিনা কে জানে, না-হলে স্রোত এত বেড়ে গেল কিভাবে? মনে হচ্ছে যেন নদীতেই সুনামি ঘটছে। যদি এমন কিছুটা হওয়া আদৌ সম্ভব হয় আর কি। কিন্তু খয়েরি রঙের পানির স্রোত বাড়ছে তো বাড়ছেই। সেই সাথে ঢেউগুলো বড় হচ্ছে আস্তে আস্তে। দুই তীর ছাপিয়ে পানি ওপরে উঠে গেছে। তীরবর্তি সবগুলো গাছ উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। ঐ গাছগুলো এসে আমি ব্রিজের যে ছোট অংশটুকুতে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে জোরে জোরে গুঁতো দিতে লাগল। এসময় একটা আস্ত কেবিন ভেসে এসে নিচের ব্রিজের পিলারে ধাক্কা দিল।

কেঁপে উঠল সম্পূর্ণটা। বড় একটা অংশ তলিয়ে গেল নিচে। এই দ্বীপের মত জায়গাটাও ভেঙে যাবে যখন তখন। পিলারের একদম ওপরে গিয়ে দাঁড়ালাম রেলিং ধরে। সাহায্য না আসা পর্যন্ত এখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব।

আবার ঘড়ি দেখলাম। তিনটা আটাশ।

উদ্ধারকারি ট্রাকগুলো কোথায়। হেলিকপ্টারগুলোই বা কোথায়?

ব্রিজটা ঝাঁকুনি খেল এই সময়। নিচের দিকে তাকালাম।

পানিতে ভেসে আসা ভারি জিনিসের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গাছের পর গাছ, একটা নৌকা, গাড়ি। আশেপাশের সব জিনিস টেনে এনেছে পানি। ব্রিজের এই অংশটুকুতেও ফাঁটল ধরছে বুঝতে পারলাম। আর বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারবে বলে মনে হয় না।

ব্রিজের অন্যপাশে এসে নিচে তাকালাম। এদিকে পানিতে বেশি জিনিস নেই, তবে অনেক ভেসে আসা জিনিস ব্রিজের সাথে আটকে আছে। চাপ সৃষ্টি করছে পিলারে, যেন একটা হাতি হেলান দিয়ে আছে বেড়ার গায়ে। যেকোন সময় ছিটকে যাবে।

মিয়াও।

"আমাদের পারতেই হবে।"

মিয়াও।

"না-হলে এসবের সাথে আমরাও ধ্বসে যাব।"

মিয়া–

আবার কেঁপে উঠল ব্রিজটা। ভূমিকম্পের আফটারশক।

ল্যাসি কলার ধরে আর কিছু না ভেবে নিচে লাফ দিলাম।

3:21 AM

মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে বরফশীতল পানির ওয়াশিং মেশিনে ছেড়ে দিয়েছে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম। তুমি একটা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছ মাত্র, এক সময় না এক সময় ভেসে উঠবেই।

কিন্তু শান্ত থাকতে পারলাম না। শ্বাস নিতে হবে আমাকে। এখনই! মোচড় দিলাম পানিতেই। পা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে উপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করলাম। পাগলের মত হাত ছুঁড়তে লাগলাম দু'পাশে। একসময় হাতদুটো ভেসে উঠল পানির ওপর, হাপড়ের মত শ্বাস নিতে লাগলাম।

আমার বাম হাতে ল্যাসির কলারটা এখন শক্ত করে ধরে রাখা। ওকেও পানি থেকে উঁচু করে ধরলাম। বেচারার হলুদ চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। জোরে জোরে বাতাস টানতে লাগল ও।

পেছনে ব্রিজের বেঁচে যাওয়া অংশটুকুর দিকে তাকালাম।

কিন্তু কিছুই নেই ওখানটাতে। খালি।

এই শূন্য ডিগ্রির কাছাকাছি পানিতে আমি কতক্ষন টিকতে পারব জানি না, কিন্তু কয়েক মিনিটের বেশি হবে বলে মনে হয় না। তবে ওতে কিছু যায় আসে না, কারণ তার আগেই যদি আমার ঘুম এসে পড়ে তবে সব জঞ্জালের চাপে পিষে ভর্তা হয়ে যাব আমরা।

ল্যাসিকে ডান কাঁধের ওপর রেখে তীরের দিকে সাঁতরানোর চেষ্টা করলাম। দীর্ঘ দশ সেকেন্ড পরে বুঝতে পারলাম আমাদের পক্ষে সম্ভব না ওখানে পৌছানো। আমরা এখন পুরোপুরি স্রোতের মর্জির ওপর। সেটা আমাদের কোন্‌দিকে নিয়ে যাবে তার ওপর আমাদের কোন হাত নেই। তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কেবল একদিকেই যাওয়া সম্ভব। নিশ্চিত মৃত্যু!

আবার তলিয়ে গেলাম পানিতে, কষ্ট করে ভেসে উঠলাম। ল্যাসিকে ঘাড়ের ওপর রেখে স্বাভাবিকভাবে সাঁতার কাটাও কষ্টের। এসময় ওগুলো চোখে পড়ল আমার।

নদীর তীরের সাথে সমান্তরাল করে একটা ডকের সাথে অনেকগুলো ক্যানো আর কায়াক বাঁধা। একেকটার সাইজ একেকরকম। নিশ্চয়ই এখান থেকে ক্যানোগুলো ভাড়া দেয়া হয়। কতগুলো কায়াক আর ক্যানো এরমধ্যেই নদীতে ভেসে গেছে কে জানে। বাকিগুলোও ভেসে যাবে নিশ্চিত।

একটা সবুজ ক্যানোকে বাদামি রঙের পানিতে ভেসে যেতে দেখলাম এসময়। নৌকাগুলো দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম। আমার পেশিগুলোতে টান লাগছে এখন। মনে হচ্ছে যেকোন সময় খিঁচুনি ধরে যাবে। কাপড়চোপড় ভিজে ভারি হয়ে গেছে।

স্রোত নিচের দিকে টানছে আমাকে।

শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করলাম।

ল্যাসি নিঃশ্বাসের জন্যে হাঁসফাঁস করছে।

আর সম্ভব না। সব কিছুর সমাপ্তি এখানেই।

কিছু একটা হুশ করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল এ সময়।

আরো দশ ফিট সামনে চলে যাওয়ার পরে বুঝতে পারলাম ওটা একটা ক্যানো।

ঘুরে তাকালাম। আরেকটা ক্যানো চলে গেল। মুখে ঠাণ্ডা পানির ঝাপটা এসে লাগল।

দুটো কায়াক নৌকা উজানের দিকে ভেসে চলেছে। দুটোই নীল। আমার পঞ্চাশ ফিট বাম দিয়ে চলে গেল ওগুলো।

আরেকটা কায়াক। লাল রঙের। উপুড় হয়ে ভেসে ভেসে আমাদের দিকেই আসছে।

হাত বাড়িয়ে ওটাকে আটকানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমার

আঙুলগুলো জমে গেছে একদম। ধরতে পারলাম না। মনে হচ্ছে যেন বক্সিং গ্লাভস পরে টুথপিক ধরার চেষ্টা করছি।

লাল রঙের কায়াকটাকে দৃষ্টিসীমার বাইরে হারিয়ে যেতে দেখলাম।

বাল!

আবার ঘুরে তাকালাম। চোখগুলো বড় বড় হয়ে গেল।

এবার সবগুলো নৌকা একসাথে ভেসে আসছে। নিশ্চয়ই যেখানটাতে ওগুলো বাধা ছিল ওটুকু ভাসিয়ে নিয়েছে পানি।

একটা নীল কায়াক ধরার উদ্দ্যেশ্যে হাত বাড়ালাম। বাম হাত দিয়ে ওল্টানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু পিছলে বেরিয়ে গেল ওটা। আর আমি পানিতেই ভাসতেই লাগলাম।

আরো আটটা নৌকা ভেসে গেল। কোনটাই দশ ফিটের মধ্যে না।

এরপর সবগুলোই চলে গেল।

না! না! না!

আমার বাম পা প্রায় অবশ হয়ে গেছে। খুব কষ্ট করে ভাসিয়ে রেখেছি আমাদের।

মিয়াও।

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালাম।

একটা ক্যানো। সবুজ রঙের। ঠিক আমাদের দিকেই আসছে, যেন আমাদের জন্যেই নদীতে ভাসানো হয়েছে ওটাকে।

আমাদের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

দাঁত দাঁত চেপে ধরলাম।

পঞ্চাশ ফিট।

চল্লিশ।

ত্রিশ।

বিশ।

দশ।

পাঁচ।

দুই।

পা দিয়ে জোরে পানিতে ধাক্কা মেরে সামনে এগোলাম। প্রথমে বাম হাত এরপর ডানহাত ওটার ওপর তুলে দিলাম। ল্যাসিকে ভেতরে ফেলে দিলাম। আমার ওজনে ক্যানোটা দুলছে। ভালোমত চড়ে বসার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। পুরো শরীর জমে গেছে।

বাম হাতটা ছুটে গেল।

যদি ডানহাতটাও ছুটে যায় তবে নিশ্চিত মৃত্যু।

ইনগ্রিডের কথা ভাবলাম। ওর পেটে আমাদের সন্তানের কথা ভাবলাম।

বাম হাতটা আবার ক্যানোর ওপরে তুলে দিলাম। আমার ওজনে ক্যানোটা দুলছে, আমিও দুলছি ওটার সাথে। এরপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে ওপরে চড়ার চেষ্টা করলাম। অর্ধেকটা শরীর উঠে গেল নৌকায়। দাঁতে দাঁত চেপে আবার ধাক্কা দিলাম পানিতে সর্বশক্তি দিয়ে। এবারে কাজ হল। উঠে পড়লাম নৌকাটাতে।

কোনমতে ল্যাসির পাশে গিয়ে ওর কলারটা শক্ত করে হাতের সাথে পেঁচিয়ে নিলাম। চিত হয়ে শুয়ে আছি। ফুসফুস কাজ করে যাচ্ছে পাগলের মত।

ওভাবেই শুয়ে থাকলাম প্রায় তিন মিনিট। ঘড়িটা চোখের সামনে নিয়ে আসলাম। অবাক হয়ে গেলাম।

তিনটা সাইত্রিশ।

ষোল মিনিট আগে ভূমিকম্পটা হয়েছে। এত কিছু! মাত্র ষোল মিনিটের ব্যবধানে।

যেটুকু শক্তি বাকি ছিল ওগুলো জড়ো করে উঠে বসলাম। কিছু একটা করতে হবে আমাকে। এভাবে এখানে পড়ে থাকলে হাইপোথার্মিয়ায় মরে যাব। আগামি তেইশ মিনিটের মধ্যে আমাকে তীরে পৌছুতে হবে। যেভাবেই হোক।

কিন্তু পরক্ষণেই পড়ে গেলাম।

একটুকুও শক্তি অবশিষ্ট নেই আর আমার মধ্যে।

অধ্যায় ৫

সূর্যোদয়–৩:০৭
আলাস্কার কোথাও

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলাম। মনে হচ্ছে যেন আবার পানির নিচে আমি, ডুবে যাচ্ছি। হাঁসফাঁস করছি শ্বাস নেবার জন্যে। পাক্কা এক মিনিট লাগল স্বাভাবিক হতে। এরপরে আরো এক মিনিট লাগল কি ঘটেছিল তা মনে করতে। ভূমিকম্প। ব্রিজ। নদী। ক্যানো।

সারা শরীরের প্রতিটা মাংসপেশিতে যেন আগুন ধরে গেছে।

কিভাবে এখনও জীবিত আছি তা মাথায় ঢুকল না। হাইপোথার্মিয়ায় আমার অবস্থা তো এতক্ষণে করুণ হবার কথা। এর একমাত্র ব্যাখা হচ্ছে এই দাবদাহ। এই তাপমাত্রাই আমাকে ঐ ছয় মিনিট পয়তাল্লিশ সেকেন্ড বরফ শীতল পানিতে ডুবে থাকার পরবর্তি প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচিয়েছে।

সোজা হয়ে দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলাম। আকাশটা কেমন হলদেটে হয়ে আছে। শান্তভাবে পানির ওপর ভাসছে ক্যানোটা। নদীর প্রস্থও আগে যেটুকু দেখেছিলাম তার তুলনায় দ্বিগুণ বলে মনে হচ্ছে। তীরবর্তি এলাকাগুলোতে দেখা যাচ্ছে বালুতট আর লম্বা লম্বা ঘাস।

এবার ক্যানোটার দিকে মনোযোগ দিলাম। প্রায় পনের ফিটের মত লম্বা এটা। তিন ফিট চওড়া। বসার জন্যে দুটো জায়গা আছে, তবে ঠাসাঠাসি করে তিনজন বসতে পারবে।

"ল্যাসি?"

দু-হাতে ভর দিয়ে পা-দানির ওপর চড়ে বসলাম।

"ল্যাসি?"

অন্য পাশটাতে খুঁজলাম এবার। ও নেই।

পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। খুব কষ্ট করে সবকিছু উগড়ে দেয়া থেকে নিজেকে ঠেকিয়ে রাখলাম।

কি আশা করেছিলাম আমি? ঘুম থেকে উঠে দেখব ব্যাটা আমার বুকের ওপর শুয়ে আছে? ওর ওজন মাত্র পাঁচ পাউন্ড। কোন সন্দেহ নেই আমার, ও জমে মারা গেছে এতক্ষণে। হয়ত উঁচু কোন ঢেউয়ের মুখোমুখি হয়েছিল আমাদের নৌকা, তখন ভসিয়ে নিয়ে গেছে ওকে।

নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম, ও একটা বিড়াল ব্যতীত কিছু নয়। তেমন একটা যায় আসবে না ওর অনুপস্থিতিতে।

লম্বা করে শ্বাস নিলাম। চোখ দিয়ে পানি গড়াতে লাগল।

"ধুর!"

হয়ত বেঁচে আছে ও। নৌকাটা হয়ত তীরের কাছাকাছি গেছিল তখন লাফ দিয়ে নেমে গেছে। ব্যাপারটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে চাইলাম। কিন্তু ভেতরটা সায় জানাল না।

ল্যাসির মৃত্যুতে যতটা না খারাপ লাগছে, তার চেয়ে বেশি খারাপ লাগছে ইনগ্রিডের কথা ভেবে। পেটে আমাদের বাচ্চাটা নিয়ে কেবিনে চাপা পড়ে আছে নিশ্চয়ই মেয়েটা। ওকে খুঁজে বের করতে হবে । বাঁচাতে হবে।

মনে মনে কিছু হিসাব কষে নিলাম। সেইনা নদীতে যদি চার ঘন্টায় বারো মাইল পাড়ি দেয়া যায়, তবে প্রতি ঘন্টায় তিন মাইল করে ভেসে এসেছে নৌকাটা। তবে ভূমিকম্পের কারণে স্রোতের তীব্রতা বেড়ে যেতে দেখেছিলাম, তখন নিশ্চয়ই নৌকার গতিও দ্বিগুণ হয়ে গেছিল। এরপরে আবার নৌকাটা কোথাও আটকেও থাকতে পারে অনেক সময়। এখন আবার অনেক আস্তে আস্তে চলছে। ঘন্টায় দু'মাইলের মত করে। সব কিছু মাথায় রেখে নৌকার গড় গতিবেগ ঠিক করলাম ঘন্টায় চার মাইল। আর প্রায় তেইশ ঘন্টার মত ভেসে চলেছে নৌকাটা। তারমানে, প্রায় একশ মাইলের কাছাকাছি।

যদি আমার কাছে সময় থাকত তবে এক সপ্তাহে এই দূরত্ব পারি দিতে পারতাম আমি। ট্রেডমিলে প্রায় দশ মাইল প্রতি ঘন্টা বেগে দৌড়াই আমি। কিন্তু এই দুর্গম জায়গায় ঘন্টায় চার মাইল যেতে পারব কিনা সন্দেহ। প্রতি ঘন্টায় যে পরিমাণ ভেসে এসেছে ক্যানোটা, সেটুকু পাড়ি দিতে আমার এক দিন করে লাগবে।

তেইশ দিন।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা চার।

সূর্য উঠবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই। আর এতক্ষণে শীতের তীব্রতা টের পেলাম। আশা করি সূর্য ওঠার পর তাপমাত্রা কিছুটা হলেও বাড়বে।

3:21 AM

নদীর গভীরতা প্রায় কোমর সমান। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বরফ শীতল পানির মধ্যে দিয়ে সামনে এগোতে লাগলাম। ডান হাত দিয়ে ক্যানোটা ধরে রেখেছি। এখন পানির গভীরতা কম। আমার হাঁটু অবধি। বালুর ওপর উঠে

এসে হুডি আর ট্রাউজারটা খুলে ফেললাম। জুতো আর মোজাজোড়া আগেই খুলে ফেলেছি। বালুতে শুঁকোতে দিলাম ওগুলো। এসব করতে করতে পাশের পাহাড়গুলোর আড়াল থেকে সূর্য বের হয়ে আসল।

শান্ত হয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। আমার উদ্ধার হবার সম্ভাবনা কতটুকু? আমি নিশ্চিত, ঘটনার পরের দিন প্লেন আর হেলিকপ্টারে ছেয়ে ছিল ফেয়ারব্যাঙ্কসের আশেপাশের আকাশ। রেড ক্রস, ন্যাশনাল গার্ড এসব উদ্ধারকারি দলও এসে গেছে এতক্ষণে, সাথে করে নিয়ে এসেছে ত্রাণ সামগ্রি, পানি আর সৈন্য। ধ্বংসস্তূপের ওপরে নিশ্চয়ই খবরের চ্যানেলের হেলিকপ্টারগুলো চক্কর দিচ্ছে। কিন্তু সেগুলোর কোন একটা আমি যেখানে আছি সেদিকে আসার সম্ভাবনা একদম নেই বললেই চলে।

বরং পানিপথে উদ্ধার হবার ক্ষীণ একটা সম্ভাবনা আছে। গ্রীষ্মকালে এখানে ক্যানো আর কায়াকের অবাধ চলাচল থাকে। ওগুলোর কোন একটা যেকোন সময় আমার পাশ দিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এখানেও একটা ব্যাপার আছে। নৌকা নিয়ে যারা নদীতে নামে তাদের বেশিরভাগই পর্যটক না-হলে স্থানীয় অতি উৎসাহি কিছু লোক, যাদের সবার আবাসস্থল ফেয়ারব্যাঙ্কস। এরকম ভূমিকম্পের পর তারা এখন হয়ত মৃত, আহত কিংবা অন্যের সাহায্যে ব্যস্ত। কেউ কেউ নিশ্চয়ই পরবর্তি প্রথম ফ্লাইটেই উড়াল দিয়েছে টাম্পার উদ্দেশ্যে। আর নদীর অবস্থাও সুবিধার নয়। দুনিয়ার জঞ্জাল ভাসছে ওটার ওপরে। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে সামনে এগোনো একরকম অসম্ভব।

একমাত্র ব্যক্তি যে আমার খোঁজ করবে সে হচ্ছে ইনগ্রিড। যদি সে আদৌ বেঁচে থাকে। ভূমিকম্পের পরবর্তি একঘন্টায় ও যদি আমার খোঁজ না পায় তাহলে সব আশা ছেড়ে দেবে। কল্পনায় দেখতে পেলাম উদ্ধারকারি দলকে আমার অবস্থা বোঝাচ্ছে ইনগ্রিড। আমি হয়ত যেকোন জায়গায় ঘুমিয়ে আছি।

"হেনরি বিনস আবার কি?" তারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবে। "কখনো শুনিনি তো আগে।" এরপরে নিশ্চয়ই আমার ব্যতিক্রমি মেডিকেল কন্ডিশনটার কথা বুঝিয়ে বলবে ও। বলবে, দিনে মাত্র এক ঘন্টা জেগে থাকি আমি। আর তাই হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সূর্য দেখতে এসেছি এখানে।

নাহ, কোন আশা নেই। প্রথম বিল্ডিঙটা ভেঙে পড়েছিল প্রায় চব্বিশ ঘন্টা আগে। আর এর আটচল্লিশ ঘন্টা পর, অর্থাৎ কালকে আমাকে মৃত বলে ধরে নেবে সবাই।

আমাকে আমার নিজেই উদ্ধার করতে হবে।

3:21 AM

পেটের ভেতর থেকে ডাক দিয়ে ওঠায় সম্বিৎ ফিরে এলো আমার। শেষ খাবার খেয়েছিলাম চব্বিশ ঘন্টা আগে। স্যান্ডউইচ আর সবুজ রঙের জুস।

দীর্ঘক্ষণ খাবার না পেয়ে আমার শরীর অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম কতটা ক্ষুধার্ত আর তৃষ্ণার্ত আমি। আরো এক সপ্তাহ হয়ত খাবার ছাড়া থাকতে পারব, কিন্তু পানি দরকার এখনই।

নদীর দিকে তাকালাম। টলটলে পরিস্কার পানি। হাত দিয়ে এক আঁজলা পানি উঠিয়ে মুখের সামনে নিলাম। কেমন যেন একটা গন্ধ। অবশ্য দেখে মনে হচ্ছে না আমার ভার্জিনিয়ার বাসার কলের পানির সাথে কোন পার্থক্য আছে। কিন্তু তার মানে এ নয়, পানিতে ব্যাক্টেরিয়া গিজগিজ করছে না। ফেলে দিলাম হাতের পানিটুকু। ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা তের বাজছে।

বালুতীরে রাখা ক্যানোটার দিকে তাকালাম। নদী বেয়ে আরো সামনে এগোলে কি হবে? স্রোতে ভাসতে ভাসতে হয়ত তীরবর্তি কোন জনবসতির দেখা পাব। অন্য কোথাও হলে হয়ত সুযোগ নিয়ে দেখা যেত। কিন্তু আলাস্কা, যেখানে একটা জনবসতি আরেকটা জনবসতির দূরত্ব কয়েকশো মাইল সেখানে এটা অনেক বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে।

কাছাকাছি তিনটা বড়সড় পাথর চোখে পড়ল। ওগুলোর দুটোতে মেলে দিলাম আমার কাপড়চোপড়গুলো। তিন নম্বর পাথরটার ওপরে দাঁড়িয়ে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। সব দিকেই পাহাড়।

"বালের একটা জায়গায় ফেঁসে গেছি," পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে নিজেই নিজেকে বললাম।

একটা গাছের চিকন ডাল পড়ে থাকতে দেখে ওটা তুলে নিয়ে আগাটা চোখা করার চেষ্টা করতে লাগলাম। সারাজীবনে আমি মোটমাট ষোলটা সিনেমা দেখেছি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে *কাস্ট অ্যাওয়ে*।

আসলে পুরোপুরি শেষ করিনি সিনেমাটা। লোকটা যখন উইলসনকে হারিয়ে ফেলে তখন বন্ধ করে দেই। অবশ্য তার আগেই দু'একটা জিনিস শিখে নিয়েছিলাম।

আমার পক্ষে খাবার ছাড়া অনেকক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব। এরকম পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেয়া কঠিন হবে না আমার জন্যে।

এরপরের বিশ মিনিট ধরে বালুতটে বড় বড় করে 'সাহায্য চাই' কথাটা লিখলাম।

তিনটা পঞ্চাশের সময় আমার কাপড়চোপড়গুলো হাতে নিয়ে দেখলাম হুডিটা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। পরে নিলাম ওটা। অন্য সব কিছু এখনও ভেজা। কিন্তু পাথরগুলো গরম হতে শুরু করেছে সূর্যের তাপে। কাল নাগাদ শুকিয়ে যাবে।

আমার হৃৎপিণ্ডটা দৌড়াচ্ছে এখন।

পানিশূন্যতার ফলাফল।

আরেকদিন পানি ছাড়া থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। নদীর পানি খেলে হয়ত অসুস্থ হব, কিন্তু না খেলে মারা যাব। এক আঁজলা পানি নিয়ে মুখে দিলাম। দুধ খাবার পরে আবার ঐ গ্লাসেই পানি খেলে যেমন লাগে পানির স্বাদ ওরকম ঠেকল আমার কাছে। পেট পুরে পানি খেলাম। নাকেমুখে ছিটা দিলাম।

তিনটা চুয়ান্নর সময় ক্যানোটাকে তিন নম্বর পাথরের দিকে নিয়ে আসলাম।

আগামি তেইশ ঘন্টা একটানা সূর্যের নিচে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তাই ওটাকে উল্টে নিচে ছায়ায় ঘুমানোর প্ল্যান আমার।

উল্টে দিতে লাগলাম ওটাকে। টুপ করে কিছু একটা নিচে পড়ল ভেতর থেকে। নৌকার সামনের দিকে কুঠুরির মত একটা জায়গা আছে। ওখানটায় নিশ্চয়ই গরম, এজন্যেই ওখানে ছিল ও।

ক্যানো ফেলে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম।

"ল্যাসি!"

চোখ পিটপিট করে অর্ধেক খুলল।

নদীর তীরে ওকে নিয়ে যেয়ে হাতে করে পানি নিয়ে ওর মুখের কাছে ধরলাম। পুরোটুকু শুষে নিল একবারে।

এক মিনিট পরে ক্যানোর তলায় ঢুকে গেলাম। ল্যাসি আমার বুকের ওপর। আমার ঘুমে তলিয়ে যাবার আগেই ও ঘুমিয়ে গেল।

অধ্যায় ৬

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
২৩শে জুন
সূর্যোদয়–৩:০৮

পেটের গর্জনে ঘুম ভেঙে গেল। অন্তত এটা আশা করছি, ওটা পেটের গর্জনই হবে। না-হলে আশেপাশের যেরকম বুনো পরিবেশ অন্য কিছুর গর্জনের কথা ভাবতেই কেমন যেন লাগল।

কিন্তু ক্ষুধার চেয়ে অন্য একটা ব্যাপার নিয়ে বেশি চিন্তা হচ্ছে।

আমার পা।

গড়ান দিয়ে ক্যানোর নিচ থেকে বেরিয়ে এলাম।

"ধ্যাত্।"

অন্তত হাজারটা মশার কামড়ের দাগ। প্রতিটা ইঞ্চি লাল হয়ে ফুলে আছে। নখ দিয়ে পাগলের মত চুলকালাম কিছুক্ষণ।

এতটা গাধার মতন কাজ করলাম কিভাবে আমি? ঐ ভেজা কাপড়গুলোই পরে ঘুমানো উচিত ছিল আমার।

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম। ল্যাসি এখনও ক্যানোর নিচে গুটিসুটি মেরে আছে।

"না, কুষ্ঠরোগ হয়নি আমার," এই বলে আরেকবার চুলকালাম। "শালার মশার দল বিনামূল্যে খাবার পেয়ে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছে।"

মিয়াও।

"আমার চেহারা? ওটায় আবার কি সমস্যা?"

হাত দিয়ে স্পর্শ করলাম কপালের আশেপাশে। শুকনোমত কী যেন উঠে এল। চামড়া। নাকে হাত দিয়ে দেখলাম ওখানেও একই অবস্থা।

মিয়াও।

"না, সাপের মত খোলস বদলায় না মানুষ!"

মিয়াও।

"বিড়ালও না।"

মিয়াও।

"হ্যা রে, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে," একটা জুসের জন্যে কী না করতে পারি এখন আমি। এমনকি ঐ জঘন্য সবুজ রঙের জুস হলেও চলবে।

মিয়াও।

"নাহ, ভালো কোন খাবারের বন্দোবস্ত নেই আমার কাছে। তুই গিয়ে নাস্তার জন্যে কিছু একটা শিকার করে নিয়ে আসছিস না কেন?"

মিয়াও।

"তোর পা? কি হয়েছে তোর পায়ে?"

এই প্রথম ভালোমত খেয়াল করে দেখলাম কিভাবে বসে আছে ল্যাসি। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে, সামনের ডান পা'টা ভেতরের দিকে গোটোনো।

নিচু হয়ে আলতো করে হাত বুলালাম ওটাতে।

গুঙিয়ে উঠল ও।

"কিভাবে হল?"

মিয়াও।

"আমার জন্যে? আমি কিভাবে করলাম?"

মিয়াও।

"আমি তোকে মোটেও মাইকেল জর্ডান যেভাবে বাস্কেটবল ছুড়ে মারে ওভাবে ক্যানোর ভেতর ছুড়ে মারিনি।"

মিয়াও।

"আরে, ওটা তো তোকে বাঁচানোর জন্যেই করেছিলাম। নাড়াতে পারছিস পা'টা?"

একটু নাড়ানোর চেষ্টা করে আবার গুঙিয়ে উঠল বেচারা। না ভাঙলেও নিশ্চয়ই ভালোমত মচকে গেছে পা'টা। যাই হোক না কেন, কয়েকদিনের মধ্যে কিছুই শিকার করতে পারবে না ও।

আরো তিরিশ সেকেন্ড পা চুলকানোর পর উঠে গিয়ে পাথরের ওপর থেকে ট্রাউজারটা হাতে নিলাম। শুকিয়ে গেছে। পরে নিলাম, আশা করছি ওগুলোর সংস্পর্শে চুলকানি কিছুটা হলেও কমবে। একটুও কমল না। জুতো মোজা পরে ক্যানোর কাছে ফিরে গিয়ে ল্যাসিকে তুলে নিলাম।

"আমাদের দুটো রাস্তা আছে," বললাম তাকে। "হেটে রওনা হতে পারি ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমরা প্রায় একশ মাইলের মত দূরে আছি। এক দিনে সর্বোচ্চ চার মাইল যেতে পারব আমি, বালুতট ধরে হাটলে সর্বোচ্চ পাঁচ মাইল। তার মানে, এক মাসের কাছাকাছি। আর তা না-হলে আবার ক্যানোতে চেপে বসতে পারি আমরা। ওটাতে অনেক দ্রুত এগোতে পারব, কিন্তু কোথায় যাচ্ছি তার কোন ঠিক-ঠিকানা থাকবে না। এমনও হতে পারে, কয়েকশো মাইল যাওয়া সত্ত্বেও কোন জনবসতির দেখা মিলল না।"

মিয়াও।

"এখন গরমকাল। আর এখানে কোন ইগলু মানব নেই।"

মিয়াও।

"জানি না, হয়ত কুড়েঘরে থাকে।"

"আমাদের যেতে হবে এখন। তো, তুই কি বলিস? পানি নাকি ডাঙা?"

ডাঙাতে আমি জানি সামনে কি পড়বে। নদীর তীর ধরে যদি পূর্বদিকে হাটতে থাকি তাহলে এক সময় না এক সময় ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌছে যাব। এমনকি পথিমধ্যে কারো সাথে দেখাও হয়ে যেতে পারে। আর ক্যানোতে করে পশ্চিমে এগোলে অজানার উদ্দেশ্যে পারি জমাতে হবে। সামনে হয়ত দেখা যাবে আরো খরস্রোতা নদীর সাথে মিলেছে সেইনা নদী, কিংবা ঝর্ণা। সোজা কথা তখন আমাদের ভাগ্য পুরোপুরি নদীর হাতে।

মিয়াও।

"নাহ, আমার মনে হয় ডাঙাই ভালো হবে।"

মিয়াও।

"তুই হাটতে পারবি? নাকি ক্যানোতে দাড় বাইতে পারবি?"

মিয়াও।

"তাহলে তোর ভোট গোণায় ধরা হবে না।"

এরপরের পাঁচ মিনিটে ক্যানোর কাছাকাছি বালুতে একটা সাহায্য বার্তা লিখে পূর্বদিকে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম।

হেনরি বিনস, ২৩শে জুন

মিয়াও।

"আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।"

...সাথে ল্যাসিও আছে।

সঙ্গে কি কি আছে হিসেব করে নিলাম। একটা ট্রাউজার, একটা হুডি, একটা টিশার্ট, জুতা, মোজা, একটা লাঠি, একটা ঘড়ি আর একটা বিড়াল।

"ঠিক আছে তাহলে," নিচু হয়ে ল্যাসিকে তুলে নিলাম। "চল্, যাওয়া যাক।"

নদীর পানি কম এখন, বালুতট সূর্যের তাপে শুকিয়ে আছে। হাটতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। এরকম শুকনো বালু আর নুড়ি পাথর যদি পুরোটা তীর জুড়ে থাকত তাহলে হয়ত দুই সপ্তাহেই পৌছে যেতাম আমরা। কিন্তু তা নেই। আধ মাইল পরপর বালুতট উধাও হয়ে যায় আর

আমাকে বাধ্য হয়ে কোমর সমান উঁচু ঘাসের মধ্যে দিয়ে সামনে এগোতে হয়। পাশে থাকে বার্চ, পাইন গাছ। প্রতিটা পদক্ষেপ বুঝে শুনে ফেলতে হয়। গতি আরো কমে যায় পোকামাকড়ের কারণে, অনবরত ঘাড়ে, হাতে, চেহারায় কামড় বসানোর চেষ্টা ওগুলোর।

ল্যাসিকে বাম হাতে আগলে রেখেছি। ঠাস করে ঘাড়ে একটা চাপড় বসালাম ডান হাত দিয়ে। এরপর সূর্যের আলোয় পরীক্ষা করলাম। পোকাটার আকার প্রায় ছোটখাট একটা পাখির সমান।

মিয়াও।

"না, এটা বাদুড় না," হেসে বললাম। "খুশি থাক যে, তোর সারা গায়ে ওরকম খাড়া খাড়া লোমে ভর্তি।"

মিয়াও।

"আরে, মজা করছিলাম। কিন্তু মারডকের কিন্তু ওরকমই।"

মিয়াও।

"হতে পারে। হয়ত সে এখন আরামসে একটা কাউচে শুয়ে আছে।"

মিয়াও।

"বিড়ালদের সর্দি লাগে না। গুল মারবি না একদম। কোন প্রমাণ দেখাতে পারবি?"

নেই কোন প্রমাণ ওর কাছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে ল্যাসির উদ্দেশ্যে বললাম, "তোকে একটা কথা বলতে চাই আমি।"

মিয়াও।

"আমি তোকে মিথ্যে বলেছিলাম। মারডকের সর্দি লাগেনি।"

মিয়াও।

"ওকে খোঁজা করা হয়েছে।"

মিয়াও।

"মানে, ওর অণ্ডকোষ দুটো ফেলে দেয়া হয়েছে।"

ল্যাসি লাফ দিয়ে আমার মুখে খামচি দেয়ার চেষ্টা করল।

শান্ত না হওয়া পর্যন্ত ওকে চেপে ধরে রাখলাম।

"আরে, ওটা আমি করিনি।"

মিয়াও।

"কারণ ও পাশের বাসার কুকুরটাকে আরেকটু হলে মেরেই ফেলেছিল।"

মিয়াও।

"হ্যা, লোলাকে।"

মিয়াও।

"না, ওর শারীরিক কোন অসুবিধা হবে না। ওর ওজন শুধু দুই পাউন্ড কমে যাবে, এই আর কি।"

মিয়াও।

"ওর পৌরুষ ছিনিয়ে নেয়ার অধিকার বাবার নেই মানে? উনি ওর মালিক। ওর জন্যে যেটা ভালো সেটাই করেছেন। যাই হোক, তোকে সত্যিটা জানাতে চেয়েছিলাম," একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম।

কোন কারণে যদি আমরা লক্ষ্যে না পৌছাই? এটাই যদি আমাদের একসাথে কাটানো শেষ দিন হয়?

এখন মনে হতে লাগল ইনগ্রিডকে এরকম পরিস্থিতিতে আমি কি বলতাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা বত্রিশ।

কি বলতাম আমি ওকে যদি আমাদের হাতে মাত্র আটাশ মিনিট থাকত?

বলতাম এই দুনিয়ায় সবকিছু থেকে ওকে বেশি ভালোবাসি আমি। মাঝে মাঝে ওর কারণেই নিজের এই মাত্র ষাট মিনিটের দিনের কথা ভেবে নিজের ওপর রাগ লাগে। কিন্তু আমি সৌভাগ্যবান, এই সীমিত মিনিটগুলো ওর মতন একটা মেয়ের সাথে কাটাতে পারি। আর আমি দুঃখিত ওর সাথে ওভাবে কথা বলার জন্যে। বাচ্চা নিলেও আমার ওর পক্ষেই থাকতাম আমি। সেটা আমার জন্যে যত কঠিনই একটা কাজ হোক না কেন, ঐ ষাট মিনিটের জীবনেই বাচ্চার সাথে সবকিছু গুছিয়ে নিতাম আমি। স্বার্থপরের মত এটা ভাবতাম না যে, বাচ্চাটা আমার জীবনের মিনিটগুলো নষ্ট করছে কোনভাবে। আর আজ থেকে ত্রিশ বছর পরে বাচ্চাটা বড় হলে তার জীবনে কি কি ঘটবে ওগুলো নিয়ে দুশ্চিন্তা করে সময়ও নষ্ট করতাম না। সব পুষিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতাম বাচ্চাটার জীবনে। একটা সাইকেল নিয়ে প্লেনের সাথে পাল্লা দেয়ার মত করে হলেও। আর ওতে ইনগ্রিডের কোন দোষ নেই।

হতাশায় মাথা নাড়তে লাগলাম আমি।

আবার ইনগ্রিডের দোষের কথা কিভাবে ভাবতে পারলাম? এতটা স্বার্থপর আমি?

একটা স্বস্তিদায়ক দৃশ্য দেখে আমার চিন্তার বাঁধন ছিড়ে গেল। সামনে আবার বালুতট দেখা যাচ্ছে। হাটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় দেড় মাইলের মতন সামনে এগোলাম।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় থেমে গেলাম আমরা। মনে মনে হিসেব কষে দেখলাম প্রায় পাঁচ মাইলের মত এগিয়ে গেছি আজ।

ল্যাসিকে নদীর পাড়ে নামিয়ে দিয়ে দু-জনই পানি খেয়ে নিলাম।

ল্যাসি সামনের পা-টা আস্তে করে নিচে রাখার চেষ্টা করেই আবার ব্যথায় গুটিয়ে নিল।

"দরকার নেই," আমি বললাম ওকে, "তোকে নিয়ে হাটতে অসুবিধে হচ্ছে না আমার," তিনদিন না খেয়ে থাকার পর ওর ওজন কমে চার পাউন্ড হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

মিয়াও।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম ওর সাথে। আমারও প্রচন্ড ক্ষিধে পেয়েছে।

আমাকে আরেকটা লাঠির খোঁজ করতে হবে। আগেরটা মশা তাড়াতে তাড়াতে ভেঙে গেছে। আশেপাশে তাকিয়ে নদীর তীরে ওরকম একটা লাঠি পড়ে থাকতে দেখলাম। আগাটা চোখাই হয়ে আছে। তবুও একটা পাথরের গায়ে ঘষে ওটাকে আরো চোখা করলাম যাতে একটা মাছ অন্তত গাঁথতে পারি।

জুতা-মোজা খুলে ট্রাউজারটা হাটু অবধি গুটিয়ে পানিতে নেমে সন্তর্পণে এগোতে লাগলাম। ঠাণ্ডা পানির প্রভাবে মশার কামড়ের জায়গাগুলোতে একটু আরাম লাগছে। এসময় পানিতে একটা রঙিন মাছকে সাঁতরে বেড়াতে দেখে চট করে লাঠিটা ছুড়ে দিলাম।

কাছাকাছি দিয়েও গেল না সেটা।

অধ্যায় ৭

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
সূর্যোদয়–৩:০৯

ঘুমিয়ে পড়ার সময়ই ক্ষুধায় পেট চো-চো করছিল। ওঠার পর কেমন লাগছে সেটা বলে বোঝাতে পারব না।

ল্যাসি আমার পাশেই ঘাসের ওপর গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলাম। পাঁজরের প্রতিটা হাড্ডি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আমার নিজের অবস্থাও এই কয়দিনে বেশ খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু আমার শরীর এরকম দীর্ঘক্ষণ খাবার না পেয়ে অভ্যস্ত। অন্যদিকে ল্যাসি একটা ছোটখাট বিড়াল, বেচারার শরীর খাবার ছাড়া একদম দূর্বল হয়ে পড়ছে।

উঠে বসে পাইনের কাঁটাগুলো শরীর থেকে ঝেড়ে ফেললাম। ঘাড়ে, হাতে আর পায়ের কিছু জায়গায় ভয়ঙ্কর চুলকাচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করলাম। ইচ্ছে করছে পাইনের কাঁটাগুলো দিয়ে যেসব জায়গা চুলকাচ্ছে সেখানে ফালা ফালা করে ফেলি। লম্বা করে নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করছি।

দশ সেকেন্ড পর আর আটকাতে পারলাম না। দীর্ঘ এক মিনিট চুলকাতে চুলকাতে লাল করে ফেললাম জায়গাগুলো। এরপর আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে কাঁধের ওপর থেকে দুটো পাইনের কাঁটা নিয়ে মুখে দিলাম। খুব কষ্ট করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করছি। উঠে আসতে চাইছিল কয়েকবার, কিন্তু তা হতে দিলাম না। নিচে তাকিয়ে দেখি ল্যাসি তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"কিরে? তুইও খেয়ে দেখবি নাকি?"

মিয়াও।

"না, এগুলো খেতে জেলিবিনের মত লাগছে না মোটেও।"

মিয়াও।

"না, আমার কাছে কোন জেলিবিন নেই আপাতত।"

মিয়াও।

"মনে হয় না কাছাকাছি কোথাও পাওয়া যাবার সম্ভাবনা আছে।"

ওকে তুলে নিয়ে নদীর পারে গিয়ে প্রতিদিন সকালে আমরা যা করি সেটা সারলাম। আমার হৃৎপিণ্ড এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বেগে

স্পন্দিত হচ্ছে। আর মনে হচ্ছে যেন কেউ আমার চোখে অটোফোকাস লেন্স ফিট করে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই ঝাপসা দেখছি। শেষ কখন ভালো কিছু মুখে দিয়েছিলাম?

এটুকু মনে আছে, স্যান্ডউইচ, জুস আর ক্যারামেল কর্ন খেয়েছিলাম। কিন্তু সেটা কি পাঁচ দিন আগে? নাকি ছয়দিন? আমার মগজ, যেটা কিনা ব্রুস লি'র মত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে, এখন একটা সুমো রেসলারের চেয়েও ধীরে কাজ করছে। একবার ঠোঁট চেটে নিয়ে উপরের উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম।

"চার দিন," মাথা নেড়ে বললাম, "চার দিন হয়ে গেল কিছু খাইনি।"

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে লাগলাম।

3:21 PM

মাছ দুটোই প্রায় এক ফিটের মত লম্বা হবে। একটা রূপালি আরেকটা লাল। পানিতে একটা বৃত্ত সৃষ্টি করে সাঁতার কেটে চলেছে। নদীর মধ্যে একটা তিন ফিট লম্বা পাথরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। হাতে লাঠিটা, আরো চোখা করে নিয়েছি ঘষে ঘষে। ল্যাসি তীর থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে দেখছে। ওর চোখজোড়া আমাকে নীরবে আকুতি জানাচ্ছে যেন একটা মাছ ধরতে পারি ওর জন্যে।

আরো কিছুক্ষণ মাছ দুটোর বিচরণক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করে ওদের সম্ভাব্য অবস্থান বের করার চেষ্টা করতে লাগলাম। যেন একদম ঠিক মুহূর্তে ঠিক জায়গায় লাঠিটা ছুড়ে গেঁথে ফেলতে পারি। কিন্তু অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারলাম না। চুলোয় যাক!

"তোদের থেকে যেকোন একজন আজ রাতে আমাদের খাবার হতে যাচ্ছিস," চিবিয়ে ওদের উদ্দেশ্যে বললাম।

দুবার লম্বা শ্বাস নিয়ে হাতের বর্শাটা ছুড়ে মারলাম চকিতে।

"শিট!" চেঁচিয়ে উঠলাম

রূপালি মাছটা ছটফট করছে লাঠির মাথায়।

"ধরে ফেলেছি!"

আমি চাই না মাছটা আবার পানিতে পড়ে যাক। আস্তে আস্তে লাঠিটা ওঠালাম। চোখা মাথাটা মাছটার পেট ভেদ করে ওপাশে তিন ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। ঘুরে গর্বিত ভঙ্গিতে ল্যাসিকে দেখালাম। যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি। ও দু-পায়ে ভর দিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে বসে আছে। চোখ চকচক করছে।

মাছটা পানির নিচে যতটা বড় মনে হয়েছিল আসলে অতটা বড় নয়। তবে আট ইঞ্চির কম হবে না। আর ওজনে এক পাউন্ডের একটু বেশি। আরাম করে খাওয়া যাবে।

মিয়াও।

"আসছি, আসছি! শান্ত হয়ে বস্," আমাকে এখনও ত্রিশ ফিটের মত হাটু পানি মাড়িয়ে তীরে পৌছতে হবে। সাবধানে এগোতে লাগলাম।

ল্যাসির দিকে তাকিয়ে না হেসে পারলাম না। উত্তেজনার চোটে ও একদম কিনারায় এসে পড়েছে।

মিয়াও।

"বল্গা? ওটা আবার কি? মাছের নাম?"

মিয়াও।

"আচ্ছা বাবা। বল্গা মাছের নাম, মানছি," এই বলে আরেকটু সামনে এগোলাম।

মিয়াও।

"একটা বল্গা মানে?"

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম।

আমার বিশ ফিট পেছনে, প্রায় দেখা যায় না এমনভাবে একটা বিশাল বল্গা হরিণ পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। আসলেই বিশাল। কমসেকম হাজার পাউন্ড। শিংগুলো পাঁচ ফিটের মতন লম্বা। সরাসরি আমার দিকে দৃষ্টি ওটার। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। তিনফিট, পাঁচ ফিট, দশ ফিট এগিয়ে গেলাম।

আর অর্ধেক পথ বাকি আছে এমন সময় পেছনের দিকে তাকালাম।

পুরো বল্গা হরিণটার শরীর এখন পানির ওপর উঠে এসেছে। আমার চেয়ে পনের ফিট পেছনে থাকলেও দূরত্বটা দ্রুতই কমছে। ওর উদ্দেশ্য আমাকে শিং দিয়ে গুতো মেরে নিচে ফেলে দেয়া, এরপর পা দিয়ে আটার মত কাই করা।

হোঁচট খেলাম এমন সময়। একদম পানির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। বাম হাতের ওপর শরীরের সব ভর পড়ল। কিন্তু তখনও ডান হাত দিয়ে মাছ সমেত লাঠিটা শক্ত করে পানির ওপরে উঠিয়ে রেখেছি। ঠিক এমন সময়ে পানির ওপর বিশাল একটা ছায়া দেখে বুঝতে পারলাম ভুল হয়ে গেছে। একটা শিং ঠিক আমার হাটুর নিচে দিয়ে এসে আমাকে উপড়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পানির ওপর ভাসমান অবস্থায় থেকে আবার পানিতেই

ডুবে গেলাম। বাকি পথটুকু কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে পার হয়ে তীরে এসে হাঁপাতে লাগলাম।

উঠে দেখি বল্গা হরিণটা আমার ঠিক ছ'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ আমার লাঠিটার ওপর।

রূপালি মাছটা তখনও কাতরাচ্ছে। দশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে এই দুনিয়ায় আর কোন চিহ্নও থাকল না ওর।

আমার দিকে কিছুক্ষণ বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকল বল্গা হরিণটা। এরপর গাছগাছালির দিকে ছুট দিল।

3:21 AM

"মাছটার জন্যে দুঃখিত।"

মিয়াও।

"হ্যা, কিন্তু কিছু একটা খেতে পারলে আসলেই ভালো লাগত।"

মিয়াও।

"কি? আমি ওভাবে তোর দিকে তাকাচ্ছি কেন মানে?"

মিয়াও।

"আমি মোটেও তোকে খাবারের দৃষ্টিতে দেখছি না!"

মিয়াও।

"আমারই বরং তোকে নিয়ে চিন্তা করা উচিত। আমি দিনে তেইশ ঘন্টা ঘুমাই। কোনদিন উঠে দেখব দুটো আঙুল গায়েব।"

কোন জবাব দিল না ও।

"ও কথা মাথায়ও আনবি না।"

মিয়াও।

"প্রমিস কর, আমরা একজন আরেকজনকে খাব না?"

ও আমার আঙুলে ওর একটা আঙুল ছুয়ে প্রমিস করল।

"একটা জিনিস ভেবে অবাক হচ্ছি। তুই হরিণটার সাথে কোন লাইন মারার চেষ্টা করলি না।"

মিয়াও।

"পরের বার? দেখবনে।"

এক মিনিট পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

আর জেগে উঠব কিনা সন্দেহ আছে।

অধ্যায় ৮

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
সূর্যোদয় ৩:১১

মুখের ওপর থেকে টি-শার্টটা সরিয়ে ফেললাম। সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা লাগছে। কয়েকবার মাথা ঝাঁকি দিয়ে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলাম। এখনও সূর্য ওঠেনি, অনেকটাই অন্ধকার। সেই আবছা আলোয় হাতের তালুর দিকে তাকিয়ে দেখলাম তালুরেখাগুলো একবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আবার পরমুহূর্তেই ঘোলা হয়ে যাচ্ছে।

উঠে বসলাম। ল্যাসি আর আমি বালুর ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মুখের ওপর টিশার্টটা দিয়ে রেখেছিলাম যাতে সানবার্ন না হয় আবার। টিশার্টটা নিচ থেকে তুলে মাথার পেছন দিকে লেগে থাকা বালুওগুলো মুছে ফেললাম।

নিচু হয়ে বাম পায়ে হাত বোলালাম। বড় একটা জায়গা কেটে গেছে। কিন্তু এর চেয়েও খারাপ হতে পারত পরিস্থিতি। বল্গা হরিণটা আমাকে অল্পের ওপর দিয়েই ছেড়ে দিয়েছে। কেবল মাছটার দিকে নজর ছিল ওটার।

নদীর ধারে গিয়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারলাম।

এরপর জাহাজের ক্যাপ্টেনের লগবুকে লিখে রাখার মত করে বললাম, "আজ ২৫শে জুন। আলাস্কার বুনো অঞ্চলে চতুর্থ দিন। কোন প্রকার খাবার ব্যতিত পঞ্চম দিন। দশ মাইল পাড়ি দিয়েছি আমরা। ল্যাসির পক্ষে এখনও হাটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাকে একটা বল্গা হরিণ আক্রমণ করেছিল। প্রতি রাতে মশারা রক্ত খেয়ে চলেছে। অসহ্য রকমের চুলকানি..."

আরো কিছুক্ষণ এরকম বকে যখন ঘড়ির দিকে তাকালাম তখন তিনটা ছয় বাজছে। ঘুরে ল্যাসি যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেদিকে হাটা দিলাম। কিন্তু কাছাকাছি পৌছেই থমকে গেলাম আমি। ভালোমত দেখার চেষ্টা করলাম।

"এটা কিভাবে সম্ভব?"

আমি আর ল্যাসি যেখানে ঘুমিয়েছিলাম তার পাঁচ ফিট ওপরে নুড়ি পাথরের মত কালো কালো কী যেন স্তুপ করে রাখা। নিচু হয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। নুড়ি নয় ওগুলো। একধরণের বেরি জাতীয় ফল।

ল্যাসিকে ধরে ঝাঁকুনি দিলাম। আস্তে করে চোখ খুলল ও।

"কোথায় পেলি তুই এগুলো?"

মিয়াও।

"এই যে, এই ফলগুলোর কথা বলছি। কোথায় পেলি এগুলো? আর কিভাবে? আমি তো ভেবেছি তুই হাটতে পারিস না।"

মিয়াও।

"আমি আনিনি এগুলো।"

তাহলে কি নদীতে ভেসে এসেছে এগুলো? নাকি কোন গাছ থেকে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে এসে জমা হয়েছে?

না, এটা সম্ভব না। তাহলে এরকম স্তুপাকারে সাজানো থাকত না।

প্রায় একশোটার মত হবে।

যেখান থেকেই আসুক, খাওয়া গেলেই হল।

মিয়াও।

"তুই আগে একটা খা।"

মিয়াও।

"মাঝে মাঝে মনে হয় তুই আসলেই গিনিপিগ হলে ভালো হত।"

মিয়াও।

"কালো মানেই মৃত্যুর রঙ না।"

"ঠিক আছে," আমি বললাম। "দু'জনই একই সময় মুখে দিব।"

ওকে একটা দিলাম।

মিয়াও।

"আমাকে একটার বেশি খেতে হবে কেন?"

মিয়াও।

"আচ্ছা, একটার বেশিই খাবো আমি। যাতে দু'জন একই সাথে মরতে পারি।"

মুঠো করে কয়েকটা ফল হাতে নিলাম।

"এক...দুই...তিন।"

মুখে পুরে দিলাম।

মিষ্টি ফলগুলো, সেই সাথে মেটে একধরণের গন্ধ। আগে কখনো এরকম বেরি খাইনি আমি। কিন্তু এটা বোঝা গেল না, এগুলো বিষাক্ত কিনা।

ল্যাসি আর আমি একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে আছি। অপেক্ষা করছি কার দেহে আগে বিষক্রিয়া দেখা দেবে।

এক মিনিট পরে বুঝতে পারলাম ওগুলো আসলেও বিষাক্ত নয়। ক্যালোরির প্রভাব সাথে সাথে পড়ল আমার শরীরে। চোখে ঝাপসা দেখা বন্ধ হয়ে গেল।

এখন যখন পেটটা একটু হলেও ঠাণ্ডা হল, তখন আবার আগের প্রশ্ন মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। বেরিগুলো আসলো কোথা থেকে?

উঠে দাঁড়ালাম।

সূর্য উঠে গেছে। সেই আলোয় আশেপাশের সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হেটে বালুতটের কিনারায় ঘন ঘাসের জঙ্গলের কাছে গেলাম।

উত্তরটা এখানেই শুয়ে আছে।

আসলেই শুয়ে আছে।

নরম ঘাসের উপর, গুটলি পাকিয়ে শুয়ে আছে একটা ছোট্ট ছেলে।

একটা ছোট্ট এস্কিমো ছেলে।

3:21 AM

ছেলেটার পরণে একটা হলুদ রঙের টি-শার্ট। ওটার গায়ে অলিম্পিকের রিঙগুলো আঁকা। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ছেলেটা রেড ইন্ডিয়ান, এস্কিমো নয়। প্রথমে বুঝতে পারিনি কারণ আমার মাথায় ছিল আলাস্কা মানেই হয়ত এস্কিমো হবে।

পা টিপে টিপে ল্যাসি যেখানে বসে আছে সেখানে ফেরত আসলাম, "ঘাসের ওপর একটা ছোট্ট ছেলে শুয়ে আছে। ওর গায়ে একটা ইন্ডিয়ান-এস্কিমো অলিম্পিকের টি-শার্ট। তারমানে, স্রোতে ভেসে গেছিল ছেলেটা ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে।"

মিয়াও।

"এই অলিম্পিকে অদ্ভুত কিছু খেলায় অংশ নেয় ওরা। ভূমিকম্প যেদিন হল, তার পরের দিন শুরু হবার কথা ছিল ওটার।"

মিয়াও।

"হ্যা, আমার মনে হয় এটা ছেলেটারই কাজ। না-হলে অন্য কে এখানে এত বেরি রেখে যাবে আমাদের জন্যে?"

মিয়াও।

"না, ওর পকেট হাতড়ে দেখতে পারব না আরো আছে কিনা," আবার তীরের দিকে হাটা দিলাম। "এখানে অপেক্ষা কর, আমি দেখি ছেলেটাকে জাগানো যায় কিনা।"

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

আমার দিন শেষ হতে আরো একচল্লিশ মিনিট বাকি।

আস্তে আস্তে হেটে ঘাসের কাছে গেলাম। মনে মনে আশা করেছিলাম গিয়ে দেখব, ছেলেটা নেই। আছে ছেলেটা, হাত দিয়ে হাটু চেপে ধরে গোল হয়ে শুয়ে আছে। ওর কাছাকাছি পৌছে গেলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম ছেলেটার গায়ের রঙ হালকা বাদামি আর চুল একদম কালো। পরণে একটা হলুদ টিশার্ট–যেটার কথা আগেই বলেছি, সাদা হাফপ্যান্ট, সাদা মোজা–যেটা গোড়ালির একটু ওপরে উঠে শেষ হয়ে গেছে। অনুমান করলাম ছেলেটার বয়স হবে পাঁচ।

দুই কদম সামনে গিয়ে বললাম "এই বাবু?"

নড়লও না ছেলেটা।

আরো কয়েক কদম সামনে এগিয়ে গেলাম, একদম ছেলেটার পাশে। বুকটা নিঃশ্বাসের তালে তালে ওঠানামা করছে। নিচু হয়ে সাবধানে ওর ডান কাঁধে হাত রেখে আলতো করে ঝাঁকুনি দিলাম।

চট করে খুলে গেল ছেলেটার চোখ।

ভেবেছিলাম ছিটকে পেছনে সরে যাবে ছেলেটা, কিন্তু তা করল না। বরং গাঢ় বাদামি রঙের চোখজোড়া আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে এরপর আমি ওর কাঁধে যেখানে হাত রেখেছি সেখানে তাকাল।

সরিয়ে নিলাম হাতটা।

আস্তে করে উঠে পা ভাজ করে বসল ও। তাকিয়েই আছে আমার দিকে।

"হ্যালো।"

উত্তরে কিছু একটা বলল। কিন্তু ওরকম শব্দ আগে কোনদিন শুনিনি আমি।

"তুমি কি ইংরেজি বলতে পার?"

আরো কিছু দুর্বোধ্য আওয়াজ।

ওহ্ খোদা।

মাটির ওপর থেকে কিছু একটা তুলে মুখে দেয়ার ভঙ্গি করে বললাম, "বেরিগুলোর জন্যে ধন্যবাদ।"

উত্তরে হাসল ছেলেটা।

দাঁতগুলো ছোট ছোট, সমান।

উঁচু হয়ে দাঁড়ালাম।

সে-ও দাঁড়াল।

বড়জোর আমার কোমর অবধি লম্বা হবে ছেলেটা।

হাটা শুরু করলাম। কয়েক কদম হেটে পেছনে তাকিয়ে দেখি ছেলেটা এখনও ঐ জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। "আসো আমার সাথে, একটা জিনিস দেখাব," এই বলে হাত দিয়ে ইশারা করলাম। আমার কথা না বুঝলেও ইশারায় কাজ হল। দৌড়ে আমার পাশে চলে আসলো ছেলেটা। হাটতে লাগল একসাথে।

দশ সেকেন্ড পরে বালুতটে ফিরে আসলাম।

"পুসি!" ছেলেটা জোরে বলে উঠল।

ল্যাসির কাছে দৌড়ে গেল ও, যার মুখটা এখন ভয়ে হা-হয়ে আছে। কিন্তু আহত পা নিয়ে নড়তেও পারছে না ব্যাটা। হাটু গেড়ে বসে পড়ে ল্যাসিকে চেপে ধরে আদর করতে লাগল ছেলেটা।

"পুসি [হিব্রু ভাষা-হিব্রু ভাষা] পুসি [হিব্রু ভাষা- হিব্রু ভাষা] পুসি।"

আমি হাসলাম। মনে হচ্ছে একটা এস্কিমো শব্দ শিখে গেছি।

ল্যাসি ভাগ্যের হাত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে আদর খেতে লাগল।

দীর্ঘ এক মিনিট পরে ওকে ছাড়ল ছেলেটা।

ইশারা করে ওর দিকে দেখাল ল্যাসি। আরো বেরি চায় হারামিটা।

একটু আগে বেরিগুলো দিয়ে ছোটখাটো একটা ভোজের পর একটু স্বাভাবিক হয়েছি বটে, কিন্তু ক্ষুধা বেড়ে গেছে বহুগুণে। "আরো বেরি কোথায় পাব?" মুখে জিজ্ঞেস করলেও হাত দিয়ে গাছ থেকে বেরি ছিড়ে মুখে দেয়ার অভিনয় করে দেখালাম।

মাথা নেড়ে ছেলেটা পাহাড়ের দিকে দেখাল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম।

তিনটা একত্রিশ।

ঊনত্রিশ মিনিট।

নিচু হয়ে ল্যাসিকে তুলে নিয়ে তিনজন মিলে ঝোপগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

3:21 PM

বেরির ঝোপগুলো বেশি দূরে নয়। পাহাড়গুলোর দিকে পাঁচ মিনিট হাটলেই।

ল্যাসি ছেলেটার কোলে যাওয়ার জন্যে জোর করায় ওকে দিয়ে দিয়েছি ছেলেটার কাছে। যাওয়ার পথে অর্ধেক রাস্তায় পোকামাকড়ের দল ঘিরে হরে আমাকে। হুডটা মুখের উপর তুলে দিলেও হাত আর পাতলা ট্রাউজারের ভিতর দিয়ে ঠিকই শুড় ঢুকিয়ে কামড় দিতে লাগল ওগুলো। কিন্তু ছেলেটার আশেপাশে একটা পোকামাকড়ও নেই। যেন পকেটে করে সে একটা অদৃশ্য স্প্রে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষন পরে পোকামাকড়ের উৎপাত একটু কমে আসলে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। ওদের চেয়ে পেছনে পড়ে গেছিলাম আমি।

ছেলেটা একটা ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওটা থেকে একটা লাল বেরি ছিড়ে নিয়ে কী যেন বলল। একটা শব্দ না বুঝলেও ছেলেটার মাথা ঝাঁকানো দেখে যা বুঝলাম, ওগুলো খাওয়া যাবে না। এরকম আরো কয়েক ধরণের বেরি দেখাল ছেলেটা যেগুলো খাওয়া যাবে না। তারপর কতগুলো দেখাল যেগুলো খাওয়া নিরাপদ। আমার হুডিটা থলের মত করে পেঁচালাম। আর এরপরের দশ মিনিট ধরে যে বেরিগুলো খাওয়া যাবে সেগুলো দিয়ে ভর্তি করতে লাগলাম ওটা।

বালুতটে যখন পৌছলাম তখন তিনটা পয়তাল্লিশ বাজছে।

দেখলাম ছেলেটা ল্যাসির দিকে একটা বেরি বাড়িয়ে ধরে একদম শেষ মুহূর্তে ওটা সরিয়ে নিল। রাগ করে ছেলেটার উদ্দেশ্যে আস্তে করে থাবা দিল ও। এরপরে ছেলেটার মুঠো থেকে একটা বেরি মুখে চালান করল।

নদীর কাছে গিয়ে এক আঁজলা পানি উঠিয়ে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি, আমার ঠোঁট পানি স্পর্শ করবে এমন সময় তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ শুনে ফিরে তাকালাম।

ছেলেটা দৌড়ে আমার কাছে আসলো। মাথা ঝাঁকাচ্ছে জোরে জোরে।

ও চায় না আমি এই পানিটা খাই।

"গত চারদিন ধরে তো এই পানিই খাচ্ছি আমরা," চার আঙুল দেখিয়ে বললাম।

আমার পেটে হাত বুলিয়ে আবার মাথা ঝাকালো ছেলেটা। এরপরে বালুতটের কাছে গিয়ে হাটু গেড়ে বসে খুড়তে লাগল হাত দিয়ে। দুই মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন ফুটের একটা গর্ত খুড়ে ফেলল।

ওর পাশে এসে গর্তের ভেতরে তাকালাম।

দীর্ঘ এক মিনিট কিছুই হল না।

এরপরে আস্তে আস্তে গর্তটা পানি দিয়ে ভরে উঠতে লাগল। নিচ দিয়ে উঠছে পানি। বালি ফিল্টারের মত কাজ করছে এখানে।

ওখান থেকে পানি নিয়ে মুখে দিল ছেলেটা। আমাকে ইশারা করলে আমিও ওর পথ অনুসরণ করলাম।

আগের চেয়ে অন্যরকম লাগছে এখন পানির স্বাদ। শুকনো বালুর মধ্যে দিয়ে আসায় পলিমাটির টুকরো নেই পানিতে। সরাসরি নদী থেকে পানি খাবার তুলনায় এভাবে পানি খাওয়াটা কতটা নিরাপদ সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার। কিন্তু হাজার বছরের এস্কিমো পদ্ধতিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার আমি কে?

তিনটা আটান্নর সময় আমার ঘড়ির অ্যালার্ম বেজে উঠল।

ছেলেটা হাতে করে ল্যাসিকে পানি খাওয়াচ্ছে।

একটা লম্বা শ্বাস নিলাম।

এখন এই বাবুটাকে কিভাবে বোঝাব আমি, আগামি তেইশ ঘন্টা আমাকে ঘুমিয়ে কাটাতে হবে? কিভাবে বলব, আমাকে এখানে রেখে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে ওর উদ্ধার হবার সম্ভাবনা বেশি? কিভাবে বলব, আমি একটা বোঝা ছাড়া কিছু না?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে অন্য চিন্তা মাথায় ভিড় জমাল।

ইনগ্রিড কোথায়? ও কি ভূমিকম্পে মারা গেছে? নাকি বেঁচে আছে, আমাকে হন্য হয়ে খুঁজছে? আমার বাবার কাছে কি খবর পৌছেছে? আমি বেঁচে ফিরলে কি হবে? আমাদের বাচ্চাটা হলে কি হবে? কিভাবে ওকে বলব আমি, ওর বাবা এখন তেইশ ঘন্টার জন্যে ঘুমোবে?

ছেলেটা ল্যাসির আহত পা'টা মনোযোগ দিয়ে দেখছে। ল্যাসি হালকা কেঁপে উঠলে ওর উদ্দেশ্যে মাফ চাওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

একটা লাঠি নিয়ে ওদের দিকে গেলাম আমি।

কাছাকাছি পৌছে এস্কিমো স্টাইলে (নাকি ইন্ডিয়ান স্টাইল?) পা ভাজ করে বসলাম। হাতটা সামনে বাড়িয়ে ঘড়ির দিকে ইশারা করে বললাম, "আমার এখন শুয়ে থাকতে হবে," হাতদুটো একসাথে করে তার ওপর বালিশের মত মাথা রাখার ভঙ্গি করে বললাম, "আগামি তেইশ ঘন্টা ঘুমোতে হবে আমাকে।"

ছেলেটা ভ্রু কুঁচকে চেয়ে থাকল আমার দিকে।

আমার ঘড়ির দিকে আবার দেখালাম। ওটা একই সাথে ডিজিটাল আর অ্যানালগ। ঘন্টার কাঁটার ওপর আঙুল দিয়ে বললাম, "এটা দু-বার পুরো ঘুরে আসা অবধি ঘুমোবো আমি," এই বলে দু-বার আঙুল ঘুরিয়ে দেখালাম।

কিন্তু ছেলেটা বুঝলো না আমি কী বলতে চাচ্ছি।

প্রথমে দুই আঙুল, এরপরে তিন আঙুল দেখালাম, "এতক্ষণ ঘুমাব আমি।"

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা।

বুঝতে পারেনি। বোঝার কথাও না। অর্ধেক মানুষই ঠিকমতো বোঝে না, আর ও তো একটা বাচ্চা। তা-ও ইংরেজি না জানা একজন।

আমি ওর দিকে ইশারা করলাম, এরপর নদীর দিকে হাত নাড়লাম, "তুমি এগোতে থাকো, আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

আবার মাথা ঝাঁকাল ও। যাবে না।

"যাও," ওকে সামনের দিকে ঠেলা দিয়ে বললাম, "যেতেই হবে তোমাকে।"

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। এরপর বল্গা হরিণটার মত ঝোপঝাড়ের মধ্যে দৌড় দিয়ে উধাও হয়ে গেল।

অধ্যায় ৯

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
সূর্যোদয়–৩:১৩

অবশিষ্ট বেরিগুলো দিয়ে নাস্তা সারছি আমি আর ল্যাসি।

বেরিগুলো অর্ধেক শেষ হবার পরে আমার দিকে তাকাল ও। কিছু একটা বলতে চায়।

"কিরে? জিজ্ঞেস করলাম, "ওভাবে তাকিয়ে আছিস কেন আমার দিকে?"

মিয়াও।

"কি মিস করছিস?"

মিয়াও।

"ওপিক (opik) আবার কি? কোন বিড়ালের খাবারের নাম?"

মিয়াও।

"বাচ্চা ছেলেটা? ওর নাম ওপিক বলছিস কেন?"

মিয়াও।

"সে বলেছে তোকে? এখন তুই এস্কিমোও শিখে গেছিস নাকি?"

মিয়াও।

"আমি মোটেও ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করিনি। আমাদের ছাড়াই ওর বাঁচার সম্ভাবনা বেশি। আমরা বোঝা ছাড়া কিছু না।"

মিয়াও।

"আচ্ছা। আমি একটা বোঝা ছাড়া কিছু না, খুশি?"

মিয়াও।

ওর দিকে একট বেরি বাড়িয়ে দিয়ে শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিলাম।

মিয়াও।

"ছেলেটা করাতে তো খুব খুশি হয়েছিলি।"

মিয়াও।

"কি এক না?"

জবাবে কেবল মাথা নাড়ল ও।

লম্বা করে একটা শ্বাস নিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, আমি নিজেও

ওপিকের শূন্যতা অনুভব করছি। যদিও আমি ওকে চলে যেতে বলেছি, বলেছি তোমাকে যেতেই হবে। তবুও আশা করিনি, আসলেই চলে যাবে ছেলেটা। কতটা স্বার্থপর আমি? মনে মনে চাইছিলাম যাতে আশেপাশে থেকে সাহায্য করে আমাদের ছেলেটা। এটা জানা সত্ত্বেও যে, আমাদের ছাড়াই নিরাপদ থাকবে ও। এতক্ষণে হয়ত কেউ খুঁজে পেয়েছে ওকে। হয়ত বসে বসে অলিম্পিকের অদ্ভুত কোন খেলা দেখছে।

কিন্তু ওসবে কিছু যায় আসে না এখন। চলে গেছে ও।

ল্যাসিকে তুলে নিলাম, কিন্তু ও আমার হাতে বারবার নড়াচড়া করে বিরক্তি প্রকাশ করতেই লাগল।

"অবুঝের মত আচরণ করিস না।"

মিয়াও।

"ও তোর সর্বকালের সর্বসেরা বেস্টফ্রেন্ড না মোটেও," বললাম আমি। "কষ্ট পেলাম কিন্তু কথাটা শুনে।"

বেরি ঝোপগুলোর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম আমি। ওখানে পাঁচ মিনিট নানা রকমের বেরি সংগ্রহ করে ফিরে আসলাম আমাদের ক্যাম্পে।

এখন তিনট সতের বাজছে।

বালুতে একটা গর্ত খুঁড়লাম, ওপিকের গর্তটা থেকে দুই ফিট দূরে। বেশ খানিকটা পানি খেলাম ওখান থেকে। ল্যাসিকে নিয়ে গর্তের কাছে ধরলাম। ব্যাটা মুখ পেঁচার মত করে রেখেছে। বললাম, "খা, সামনে বালুতট পাব নাকি জানি না।"

চুকচুক করে পানি খেতে লাগল ও।

একটা লাঠি নিয়ে বালিতে লিখলাম :

২৬ শে জুন। নদীর পাশ দিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছি। হেনরি বিনস আর ল্যাসি

মিয়াও।

"না, ওপিকের নাম যোগ করব না আমি।"

মিয়াও।

"কারণ ও চলে গেছে। এখান থেকে অন্তত বিশ মাইল দূরে ও এখন।"

মিয়াও।

ঘুরে তাকালাম।

ওপিক দাঁড়িয়ে আছে বহাল তবিয়তে।

হাসছে।

আর ওর হাতে দুটো তাজা মাছ।

3:21 AM

ল্যাসি আর আমি দেখছি ওপিক কিভাবে চোখা লাঠি দিয়ে মাছের পেটটা ফেড়ে ফেলল। ভেবেছিলাম নাড়িভুঁড়ি পরিস্কার করার জন্যে ও কাজ করছে, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, নাড়িভুঁড়ি সহজে বের করে আনার জন্যে কাজটা করেছে। ওগুলো বের করে এনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"না, তুমিই খাও," মাথা নেড়ে বললাম। "তুমি ধরেছ ওগুলো।"

জীবনে একবারই শুশি খেয়েছিলাম, আর ওতেই শিক্ষা হয়ে গেছে।

মাছের নাড়িভুঁড়ি, ধীরে ধীরে গলা দিয়ে নামছে।

না, মাফ চাই।

ওপিক ল্যাসির দিকে বাড়িয়ে দিল ওগুলো। মুহূর্তে সাবাড় করে ফেলল ব্যাটা।

ওপিক যখন বুঝতে পারল, মাছের চোখ, হৃৎপিণ্ড, কিডনি খাওয়ার প্রতি কোন আগ্রহ নেই আমার, তখন মাছের পেট থেকে বড় একটা অংশ কেটে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

হাতে নিলাম, সম্পূর্ণ সাদা মাছের ভেতরটা। চামড়ার ওপর দিয়েই কামড় দিলাম।

পাঁচ দিনের অভুক্ত থাকার পরে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করে ফেললাম ওটুকু। এমনকি মাছের কিডনিও মুখে দিলাম। যতটা ভেবেছিলাম অতটা খারাপ না। কিন্তু চোখ পর্যন্ত গেলাম না। বললাম, "পরে না-হয়..." সাথে সাথে ল্যাসি চালান করে দিল ওটা পেটে।

ওপিকের ঘাড়ে আস্তে করে হাত রেখে বললাম, "ধন্যবাদ।"

ও হাসল জবাবে।

"আমার নাম হেনরি," নিজের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, "হেনরি।"

"ওন-রি," ও বলল।

"কাছাকাছি।"

"ওপিক," নিজের দিকে নির্দেশ করে বলল ও।

মাথা নেড়ে আমিও বললাম ওর নামটা।

এবার ল্যাসির দিকে দেখিয়ে বললাম, "ল্যাসি।"

"পুসি!" উৎসাহের সাথে বলল ছেলেটা।

"কাছাকাছি," হেসে বললাম।

ল্যাসিও কিছু মনে করেছে বলে মনে হল না। ওপিক যদি এভাবে খাবার এনে দেয় আর পেটে আদর করে দেয় তাহলে তার যা খুশি তা-ই ডাকতে পারে।

ওপিক ঝোপের ওদিকে গিয়ে আমার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে ওকে অনুসরণ করতে বলল।

ল্যাসিকে তুলে নিয়ে বললাম, "চল্ পুসি।"

আমি ওপিকের পেছন পেছন যেতে লাগলাম। ও আমার জন্যে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। ওকে ঘড়িটা দেখালাম। চারের ঘরের ওপর টোকা দিয়ে বললাম, "আমাকে চারটার আগেই ফেরত আসতে হবে।"

ও মাথা নাড়ল জবাবে।

ও কি বুঝেছে নাকি আমি কি বললাম? এটা কি সম্ভব, কাল চলে যাওয়ার পর ও ঠিক এমন সময়ই ফেরত আসলো যখন আমি ঘুম থেকে জেগেছি। তা-ও তেইশ ঘন্টা পর।

না, কাকতালিয় হতে পারে না এটা।

ওপিকের পেছন পেছন যেতে যেতে বুনো ঘাসের ময়দানে চলে আসলাম। পেট ভরা থাকার কারণে প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারছি। ভূমিকম্পের পরে বোধহয় এই প্রথম আবার সূর্যের কারিশমায় মুগ্ধ হলাম। কি সুন্দর সোনালি রঙের আভা ছড়াচ্ছে পাহাড়ের পেছন থেকে।

আমার হাতে কে যেন টোকা দিল।

ওপিক।

ওর সাথে গেলাম, ছোট্ট হাতটা আমার মুঠোয়।

দশ মিনিট পর একটা ঘন ঝোপের কাছে পৌছলাম আমরা। ওপিক আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঝোপটা দেখতে লাগল। কী যেন খুঁজছে।

"কি খুঁজছ, বাবু?" জিজ্ঞেস করলাম।

আরো বেরি খুঁজছে? নাকি আলু গাছে ধরে? বাদাম? ঝোপের ভেতরে কোন প্রাণি নেই তো? সাবধান হয়ে গেলাম।

ওপিক একটা হলুদ রঙের ফুল ছিড়ল। এরপর গন্ধ শুকে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল।

আমি মাথা ঝাকালাম।

আবার আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা। এবার গন্ধ নিলাম। মিষ্টি একটা গন্ধ।

ও মাথা ঝাঁকিয়ে ফেলে দিল ফুলটাকে।

পঞ্চাশ ফিট সামনে গিয়ে আরেকটা ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। এগুলোর গায়ে বেগুনি রঙের ছোট ছোট ফুল। গন্ধ শুকল, এবার সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নেড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরল। বুনো একটা গন্ধ।

একটা ডাল ভেঙে নিল ও, লম্বা লম্বা পাতাসহ।

বালুতটে যখন ফেরত আসলাম আমরা, তখন বাজছে তিনটা সাতচল্লিশ।

ওপিক পানির কাছে দাঁড়িয়ে ডাল থেকে পাতা আলাদা করছে। প্রায় বিশ পঁচিশটার মত পাতা জমেছে ওর পাশে।

ল্যাসি আর আমি চুপচাপ বসে ওর কাজ দেখছি।

মিয়াও।

"জানি না, হয়ত ওগুলো খেতে হবে আমাদেরর। কোন ঔষধি গুণ আছে।"

ইনগ্রিডের কথা মনে পড়ে গেল। কোথায় মেয়েটা? ও কি আশা ছেড়ে দিয়েছে, আমি বেঁচে আছি? আলেক্সান্দ্রিয়ায় আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গেছে এতদিনে? কাজে ফিরেছে? আজ রাতে কি খাবে ও?

ওপিক ফুলসহ ডালটা নদীতে ফেলে দিল। এরপরে নিচু হয়ে পাতাগুলো তুলে পানিতে ভেজাল। হাত দিয়ে পিষতে লাগল যতক্ষণ না সবুজ রঙের জেলের মত কিছু একট গড়াতে লাগল পাতাগুলো থেকে। এরপরে আমাদের কাছে এসে বসে পড়ল। হাতে পাতার জেলের মত পদার্থ। ল্যাসির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

ওর থাবা।

ভয়ে ভয়ে থাবাটা সামনে বাড়িয়ে দিল ল্যাসি।

ওপিক ওর পুরো পায়ে সবুজ জেল লাগিয়ে দিল ভালোমত। থাবাটা হাতে নিয়ে কী যেন বলল বিড়বিড় করে, এরপর উঠে দাঁড়িয়ে উধাও হয়ে গেল।

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখনও ফেরত আসেনি ও।

অধ্যায় ১০

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
২৭ জুন
সূর্যোদয়–৩:১৫

ঘুম থেকে জেগে দেখি আমাদের চারপাশে রাজ্যের খাবার সাজানো। মাছ, বেরি ফল, নানা জাতের বাদাম।

আমাদের থেকে বিশ ফিট দূরে ওপিক লক্ষ্মি ছেলের মত ঘুমাচ্ছে। হাতদুটো মাথার নিচে বালিশের মত করে রাখা। ঠিক যেমনটা সিনেমায় দেখা যায়। এই আবছা অন্ধকারে নিষ্পাপ মুখটাকে আরো নিষ্পাপ মনে হচ্ছে। কোন পঙ্কিলতার ছোয়া নেই ওখানে। কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল ভেতরটা। আমি যখন ঘুমিয়ে থাকতাম বাবারও কি এমন লাগত?

ল্যাসিকে বুকের ওপর থেকে নামিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে। গত পাঁচদিনে এমন লাগেনি।

ভ্রু কুঁচকে গেল।

চুলকানি।

কোথাও চুলকাচ্ছে না। আমার কাপড়ের দিকে তাকালাম। ওগুলোর ওপরে এক ধরণের সাদা রঙের পাউডার ছিটানো। আমার হাতেও দেখলাম একই অবস্থা। না হেসে পারলাম না।

এগুলো যা-ই হোক না কেন, গত তেইশ ঘন্টা যাবত মশাদের ঠিকই দূরে রেখেছে।

ওপিকের পাশে গিয়ে ওর আলতো করে ওর ঘাড়ে হাত রাখলাম।

চোখ খুলল ও।

"বাবু।"

সুন্দর একটা হাসি দিল।

"ঐ পাউডারের জন্যে ধন্যবাদ," আমার কাপড়চোপড়ের দিকে ইশারা করে বললাম।

জবাবে ও ওর হাত গলার চারপাশে জড়িয়ে ধরল।

"বুঝতে পেরেছি, মশাদের দম বন্ধ করে দেয়।"

ওকে উঠে দাঁড়ানোয় সাহায্য করে খাবারের পাশে এসে বসলাম

দু'জনে। এরপর খাবারের স্তূপ থেকে খাওয়া শুরু করলাম। ওপিক ল্যাসির পা কোলে নিয়ে দেখতে লাগল। ল্যাসির মতে এখন নাকি একটু ভালো লাগছে। বাকি পাতাগুলো দিয়ে আবার জেল বানিয়ে ল্যাসির পায়ে মুড়ে দিল ছেলেটা। আমি নদীর দিকে দুই আঙুল দিয়ে হাটার ইশারা করে দেখালাম।

তিনটা সাতের সময় ক্যাম্প গুটিয়ে রওনা হলাম আমরা।

আগামি পঞ্চাশ মিনিটে বেশ ভালো দূরত্ব অতিক্রম করে, বালুতটে সুন্দর একটা জায়গা খুঁজে পেলাম শোবার মত। ল্যাসি আর ওপিক ঝোপের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। কিন্তু কোন দুশ্চিন্তা হল না যে, আমার অবর্তমানে ওরা দু-জন কী করবে। যতক্ষণ ওরা খাবার জোগাড় করছে আর এই জাদুর পাউডার বানাচ্ছে ততক্ষণ চিন্তা করার কিছু নেই।

আর সেটাই করেছে ওরা।

পরের দিন উঠে দেখি তিনটা মাছ, নানা জাতের বেরি আর ক্যাকটাস জাতীয় একটা গাছ (যেটার ভেতরের শাঁসটা খেতে দারুণ সুস্বাদু) অপেক্ষা করছে।

সকালে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে নেই আমরা। এরপর যাত্রা শুরু করি, একদিনে যতটা সম্ভব বেশি দূরত্ব পাড়ি দেয়া যায়। ল্যাসি ওর তেইশ ঘন্টা ওপিকের সাথে কিভাবে কাটাল এগুলো আবার আমার কাছে রিপোর্ট করে। কিভাবে ওপিক একটা গাছে উঠে সুস্বাদু বাদাম পাড়ল। কিভাবে ল্যাসির পায়ে সুন্দর মতন ম্যাসাজ করে দিল। এখন নাকি ঐ পায়ে ভরও দিতে পারে ও। সবচেয়ে অবাক হলাম ওপিক কিভাবে মাছ ধরে সেটা শুনে। হাত দিয়ে আলতো করে টোকা দেয় পানির ওপরে। ঠিক যেমনটা একটা পোকা বসলে হয়। মাছ আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশে ঘোরা শুরু করে। তখন লাঠি দিয়ে জোরসে একটা বাড়ি দিয়ে অসার করে দেয়। তারপর ছোঁ মেরে তুলে আনে।

আমার হিসেবমতে গত তিন দিনে গড়ে ছয় মাইল করে পাড়ি দিয়েছি আমরা। আর ওপিকের সাথে দেখা হবার আগে আরো আট-দশ মাইল। এখন যেভাবে সবকিছু চলছে, তাতে আগামি দশদিনে আমরা ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌছে যাব।

আমার আত্মবিশ্বাস আরো বেড়ে গেল যখন ল্যাসি নদীতে একটা পতাকা ভাসতে দেখাল। ব্রিজের ওপর ঝোলান পতাকাগুলোর একটা বলে মনে হল।

ঠিক পথেই যাচ্ছি আমরা।

আরো এক মাইল বালুতট ধরে হাটলাম। এরপর বালুতট কমতে কমতে নদীর সাথে মিশে গেল একসময়। সামনে ঘাস।

লম্বা বুনো ঘাসের ওপর দিয়ে হাটতে আমার অস্বস্তির কথা বুঝতে পেরে হাতটা ধরল ওপিক। এই ঘাসের মধ্যে যে কোন কিছু লুকিয়ে থাকতে পারে। এই যেমন বল্লা হরিণ! সেদিন আরেকটু হলেই আমার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিয়েছিল। বালুতটের ওপর দিয়ে হাটলে আশপাশটা অন্তত ঠিকমতো নজর দেয়া যায়। হঠাৎ করে কিছু বেরিয়ে আসলে প্রস্তুতির একটা সময় থাকে। কিন্তু এই ঘাসের মধ্য নিজেকে কেমন যেন আফ্রিকার বুনো অংশে শিকার হবার অপেক্ষায় থাকা হরিণের মত মনে হয়।

ঘন ঝোপঝাড় ভেঙে সামনে এগোচ্ছি আমরা। কখনো পাথরের ওপর দিয়ে, কখনো আবার ডাল আঁকড়ে ধরে।

তিনটা তেতাল্লিশের সময় ওটাকে দেখলাম আমরা।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

ওটার আশেপাশে এমনভাবে বুনো গাছগাছালি জন্মেছে, দেখে মনে হয় জঙ্গলেরই অংশ। কিন্তু ভুল হবার অবকাশ নেই।

একটা কাঠের কেবিন।

3:21 PM

কেবিনটার পুরো ভগ্নদশা।

কাঠগুলো শুকিয়ে ধূসর হয়ে গেছে। কয়েক জায়গায় ছাদের কাঠ ধ্বসে পড়েছে। আর মেঝেতে বেশ কয়েকটা গর্ত, সাবধানে পা ফেলতে হয়। ঠিক থাকতে মনে হয় দশ ফিটের মত লম্বা ছিল। এখন ছয় ফিট। কাঠের দেয়ালের একপাশে একটা মই ঠেস দিয়ে রাখা। জানালা আর দরজাগুলোর জায়গায় ফাঁকা।

ওপিক দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লে আমি আর ল্যাসিও ওর পিছু পিছু গেলাম।

জানালা আর ছাদের খালি জায়গাগুলো দিয়ে বেশ ভালো আলো বাতাস ঢুকছে।

বাইরের ভগ্নদশার তুলনায় ভেতরটা বেশ গোছানো মনে হল। ঝুলঝাড়, মাকড়সার জাল আর কিছু ছোট আগাছার কথা বাদ দিলে ভেতরটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, আগে যে-ই থাকুক না কেন, খুব সাজানো গোছান

ছিল। দেয়ালের সাথে একটা আয়না আর একটা ঝুলন্ত শেলফে কিছু হার্ডকভার বই ঝুলছে। আয়নার ওপরে হাত বুলিয়ে তিন ইঞ্চি ধুলোর আস্তরণ সরালাম। আমার মুখটা দেখা যাচ্ছে। প্রতি দুই দিন অন্তর অন্তর ইলেক্ট্রিক্যাল রেজর দিয়ে শেভ করতাম আমি। আর সবসময় চাপদাড়ি থাকত। কিন্তু এই আটদিনে বেয়ারাভাবে বেড়ে উঠেছে দাড়ি। আর সূর্য থেকে বাঁচার জন্যে মুখের ওপর কাপড় দিয়ে ঘুমালেও গতানুগতিকের চেয়ে পাঁচগুণ কালো দেখাচ্ছে।

আমাকে দেখতে একজন স্বাভাবিক খেটে খাওয়া মানুষের মত লাগছে। দেখে মনে হচ্ছে না, আয়নার ভেতর থেকে যে তাকিয়ে আছে সে দিনে তেইশ ঘন্টা ঘুমিয়ে কাটায়।

আপনমনে একবার হেসে ঘরের এক কোনায় রাখা স্টোভের দিকে এগিয়ে গেলাম। বাসন কোসনগুলো এখনও তাকে গুছিয়ে রাখা। পাশে লবণ আর গোলমরিচদানি। বেশ কয়েকটা ক্যানজাত খাবারের কৌটো দেখলাম। কোনটায় ছাতা ধরে গেছে আবার কোনটা মরিচায় জরাজীর্ণ। ওগুলোর পাশে একটা কাঁচের বোতল রাখা। হাত দিয়ে ওটার গায়ের ধুলো পরিস্কার করে মৃদু হাসলাম।

ল্যাসি আর ওপিককে ডাক দিলাম।

তথ্যটা কোথায় দেখেছিলাম মনে নেই। এই পৃথিবীতে একটা খাবার কখনো নষ্ট হয় না।

মধু।

ক্যাপ খুলে এক আঙুলে ভরিয়ে মুখে দিলাম অল্প একটু। একদম ঠিকঠাক।

বোতলটা ওপিকের হাতে দিয়ে দিলাম। ওখান থেকে কিছুটা নিজে খাবার পর বাকিটা আঙুলে ভরিয়ে ল্যাসিকে খাওয়াতে লাগল ও। জানালার নিচে একটা বড় কুঠুরি দেখতে পেলাম। ওটার হাতল ধরে জোরে বেশ কয়েকবার টান দিতেই খুলে গেল। একটা জুতো, পশমি জ্যাকেট আর লণ্ঠন–ওরকম বিশেষ কিছু না। কিন্তু একটা জিনিস দেখে বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। একটা ম্যাপ!

3:21 AM

এখন তিনটা সাতান্ন।

দৌড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর ম্যাপটা বিছালাম। এর আগে বেশ

কয়েকবার রাস্তার ম্যাপ দেখেছি। এটা ওগুলো থেকে এক দিয়ে অন্যরকম। নদীর ম্যাপ এটা।

ওপিক আর ল্যাসি আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটা কালো বিন্দুর চারপাশে বৃত্ত আঁকা দেখে ধারণা করলাম ওটাই এই কেবিনটা। দীর্ঘ এক মিনিট ম্যাপটার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকলাম।

"হায় ঈশ্বর।"

হাত দিয়ে জোরে টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মারলাম। ল্যাসি লাফ দিয়ে ওপিকের কোলে উঠে গেল।

"আমরা ভুল নদী ধরে এগিয়ে গেছি!" চিৎকার করে বললাম।

আমি ধারণা করেছিলাম, এতদিন সেইনা নদীর পাশ দিয়েই এগিয়ে গেছি। সেরকম নয় মোটেও।

ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। সেইনা নদী হচ্ছে একটা উপনদী যেটা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে তানানা নদীর সাথে মিশেছে। তানানা নদী আবার উত্তর-পশ্চিমে নব্বই মাইলের মত গিয়ে ইয়োকু নদীতে পড়েছে যেটা কানাডা থেকে প্রবাহিত হয়ে মিশেছে বেরিং সাগরে।

আমি যখন ক্যানোতে ভাসছিলাম তখন ইয়োকু নদীতে ছিলাম। এরপরে আমি আর ল্যাসি উল্টোদিকে দশ মাইল হেটে ওপিককে পাই। এরপরে নদীর উত্তর পাশের তীর ধরে উল্টোদিকে হাটছিলাম আমরা। এক পর্যায়ে বালুতট শেষ হয়ে যাওয়াতে ঘাসের ভেতর দিয়ে হাটতে বাধ্য হই, যেকারণে টানানা আর ইয়োকু নদীর মোহনা চোখে পড়েনি আমাদের। সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটা হয়েছে ইয়োকু নদী ধরে উত্তর পূর্বদিকে যাওয়া, যেখানে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল দক্ষিণপূর্বদিকে তানানা নদী ধরে। তাহলে কিছু পরে সেইনা নদীর দেখা পেতাম আমরা। আর তার কিছু পরেই ফেয়ারব্যাঙ্কস।

হলুদ পতাকাটার কথা ভাবলাম। ওটা মোটেও ভেসে আসেনি এদিকে। কারণ স্রোতের বিপরীত দিকে ভাসা অসম্ভব। অন্য কোন পতাকা ওটা।

ম্যাপের ডানদিকে দূরত্ব মাপার ছকের ওপর হাত রেখে আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে ফেয়ারব্যাঙ্কসের দূরত্ব মাপলাম।

"একশ বিশ মাইল," হতাশ হয়ে টেবিলের ওপরেই শুয়ে পড়তে পড়তে বলতে লাগলাম, "একশ বিশ মাইল।"

অধ্যায় ১১

ব্যাংলাবুক্স ডিরেক্ট লিঙ্ক
২৯ শে জুন
সূর্যোদয়–৩:২০
ইয়োকু নদীর তীর

রান্নাঘরের টেবিলটাতেই ঘুম ভাঙল আমার। উঠে দেখি আশেপাশে ল্যাসি আর ওপিক নেই। ম্যাপটা আগের জায়গাতেই আছে।

ম্যাপের ওপর ঝুঁকে আবার দূরত্বটা পরিমাপ করলাম, আশা করছিলাম, এবার হয়ত কমে আসবে ওটা। এক ইঞ্চি মানে হয়ত দু-মাইল হবে, বিশ মাইল না। কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। ম্যাপ অনুযায়ি নদীপথে ফেয়ারব্যাঙ্কস থেকে ছয় ইঞ্চির দূরত্বে আমরা। তারমানে পাক্কা একশ বিশ মাইল। মাঝখানে অনেক পাহাড়, যেগুলোকে ঘিরে এঁকেবেঁকে চলেছে নদীগুলো। ফিরতি পথে যেকোন সময় হারিয়ে যেতে পারি আমরা। যার কারণে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত দেরি হয়ে যেতে পারে।

আমাদের নদীপথ ধরে এগোতে হবে। যার মানে :

১. ইয়োকু নদীর উত্তর তীর থেকে দক্ষিণ তীরে যাওয়া।

২. এরপরে উল্টোদিকে পনের মাইল উজানে যেতে হবে, যেখানে তানানা আর ইয়োকু মিলেছে।

৩. তানানা নদী ধরে নব্বই মাইল দক্ষিণপূর্ব দিকে সেইনা নদী বরাবর যাত্রা।

৪. সেইনা নদী ধরে উত্তর-পূর্বে আরো পনের মাইল গেলে পড়বে ফেয়ারব্যাঙ্কস।

আজকে রওনা দিলেও একমাস লাগবে। জুলাইয়ের শেষদিকে পৌছুতে পারলেও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে গেল মুখ থেকে অজান্তেই। এতটা পরাজিত মনে হয়নি কখনো নিজেকে। এখন ইনগ্রিডের সাহচর্য খুব দরকার আমার। ওকে বুকে চেপে ধরে এই ষাট মিনিট যদি কাটাতে পারতাম!

ঘড়ির দিকে তাকালাম। তিনটা চার বাজে।

টেবিলটার ওপরে উঠে ফের শুয়ে পড়লাম চোখ বুজে। প্রার্থনা করতে লাগলাম যাতে খুব তাড়াতাড়ি চারটা বেজে যায়।

বাজল না।

আমার ঘাড়ে কে যেন হাত দিয়ে ধাক্কাচ্ছে।

চোখ খুললাম আমি। ওপিক আমার দিকে তাকিয়ে একটা হাসি দিল। ওর হাতে বাদাম বা বেরি জাতীয় কিছু একটা, যেটা এখন পর্যন্ত দেখিনি আমি। ওটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলে মাথা নেড়ে না করে দিলাম। খেতে ইচ্ছে করছে না।

খাবারটা আমার পাশে রেখে টেবিলের ওপর উঠে গেল ও। এরপর দুই হাত দিয়ে আমাকে ঠেলতে লাগল।

"থামো।"

আমার নিচ থেকে ম্যাপটা নিয়ে নেমে গেল ও।

এক মিনিট পর।

"অন-রে! অন-রে!"

চোখ খুললাম আমি।

হাত দিয়ে ম্যাপে টোকা দিল ও।

উঠে বসলাম। "কি?"

হাত নেড়ে আমাকে টেবিল থেকে নেমে আসার জন্যে ইশারা করল।

আমি নেমে আসার পর ম্যাপটা আরো ঠিকমত বিছালো ও। এরপর একটা কাঠের চেয়ারে উঠে হাটুতে ভর দিয়ে বসল। যে কালো বিন্দু কেবিনটাকে নির্দেশ করছে ওটার দিকে দেখাল প্রথমে। এরপর ইয়োকু নদীর ওপর দিয়ে আট ইঞ্চি দূরে আরেকটা কালো বিন্দুর দিকে দেখাতে লাগল।

আমি মাথা ঝাঁকালাম।

নদীর ওপর জায়গাটা দেখিয়ে এস্কিমোতে কিছু বলা শুরু করল।

"কি বলছ বাবু? বুঝতে পারছি না তো।"

জবাবে মাথা নাড়তে লাগল। এরপরে হঠাৎ ভ্রু দুটো উপরে উঠে গেল। নিজের পরনের শার্টের ওপর নির্দেশ করে ইন্ডিয়ান শব্দটা দেখাতে লাগল।

"এখানে ইন্ডিয়ানরা থাকে?"

মাথা নাড়ল ও। ইন্ডিয়ান শব্দটা বুঝতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের জন্যে আশার আলো দেখতে পেলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল আট ইঞ্চি মানে তো আগের চেয়েও বেশি দূরে।

"বেশি দূর," এই বলে আঙুল দিয়ে আগের রাস্তাটা দেখালাম ওকে, "এদিক দিয়ে গেল ভালো হবে।"

জোরে জোরে মাথা ঝাকালো ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমার দেখানো রাস্তাটার ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাত বোলাল একবার। এরপরে ইয়োকু নদীর ওপরে ওর রাস্তাটা দিয়ে হাত বোলাল। এবার অনেক তাড়াতাড়ি।

আরো এক মিনিট কিছুই বুঝলাম না আমি।

যতক্ষণ না পর্যন্ত ও আমার হাত ধরে কেবিন থেকে বের হয়ে নদীর তীরে নিয়ে গেল।

ল্যাসিকে দেখলাম ওখানে।

একটা নৌকার ওপর বসে আছে।

3:21 AM

মিয়াও।

"পাহারা দিচ্ছিস নৌকাটা?"

মিয়াও।

নৌকাটার দিকে দেখিয়ে বললাম, "এটাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কয়েক বছর ধরে এখানে পড়ে আছে। তোর কি মনে হয় এখন কেউ চুরি করতে আসবে এটাকে? ওপিক আমাকে ডাকতে যাওয়ার মাঝখানে?"

মিয়াও।

"ভাল্লুক? চাপা মারিস না!"

মিয়াও।

"তুই মোটেও দুইবার ভাগিয়ে দিসনি ওটাকে।"

আমার কব্জিতে কে যেন টোকা মারল।

ওপিক। আমার ঘড়িতে টোকা দিচ্ছে।

এখন তিনটা আঠার বাজছে।

ও জানে, আমার হাতে সময় বেশি নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়তে চায়।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

ওপিকের উপস্থিতি সবকিছু বদলে দিয়েছে। নৌকা চালানোর ব্যাপারে যদি ওর খাবার সংগ্রহ আর মাছ ধরার মত জ্ঞান থেকে থাকে তাহলে ওর ওপর ভরসা করা যায় নির্দ্বিধায়। হালে ওকে বসিয়ে রেখে দু-দিনে ঐ

ইন্ডিয়ান গ্রামটায় পৌছে যাব আমরা। পত্রিকার শিরোনামটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি : সাইত্রিশ বছরের এক লোক আর তার বেড়ালকে উদ্ধার করল পাঁচ বছরের এক এস্কিমো বালক।

ওপিক আর আমি কেবিনে দৌড়ে গিয়ে যত দ্রুত সম্ভব সব কিছু নিয়ে ফেরত আসলাম।

আমরা যখন সবকিছু নৌকায় সাজিয়ে রাখছি তখন আকাশে গোলাপি আভা দেখা দিয়েছে। একে একে ম্যাপ, মধুর বোতল, লণ্ঠন, জ্যাকেটটা তুলে ফেললাম। এরপরে নৌকাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলাম। সবকিছু ঠিকঠাকই মনে হল। উপরি পাওনা হিসেবে একটা বৈঠা দেখতে পেলাম পাটাতনে ওপর।

আমি আর ওপিক দু-জনেই নৌকার একপাশে গিয়ে ওটার গায়ে হাত রেখে দাঁড়ালাম। ধাক্কা মারতে হবে।

"এক...দুই–"

এমন সময় বিকট একটা গর্জন শুনে আমরা দু-জনই চমকে ফিরে তাকালাম। ঠিক যেমনটা ছবিতে দেখেছিলাম। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ হা করা। তীক্ষ্ণ নখযুক্ত থাবা দিয়ে বাতাসে খামচাচ্ছে।

মিয়াও।

হ্যা, আগেই বলেছিলি।

"কি করব আমরা এখন?" কাতর স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

ওপিক একটা পাথর নিয়ে বাদামি গ্রিজলি ভাল্লুকটার দিকে ছুঁড়ে মারল। এতে মনে হয় আরো বেশি রেগে গেল ওটা। বাতাসে আগের চেয়ে জোরে জোরে খামচাতে লাগল। থাবার আঘাতে একটা গাছের ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে গেল।

পানি থেকে আমাদের দূরত্ব মাপলাম। কমসেকম পাঁচবার ধাক্কা দিতে হবে। নদীতে নৌকাটা পড়লেই চলতে শুরু করবে স্রোতের টানে। কিন্তু তখন ওটার ভেতরে তখন তিনজনকেই থাকতে হবে আমাদের।

ভাল্লুকটা পনের ফিট দূরে। যদি আসলেই নৌকাটা চায় ও, তাহলে ঠেলতে দেখলে সাথে সাথে তেড়ে আসবে।

বাবার বলা একটা কৌতুকের কথা মনে পড়ে গেল এসময়।

দুই বন্ধু বনের ভেতরে ঘুরছিলো। এমন সময় একটা ভাল্লুক তাড়া করা শুরু করে ওদের। প্রথম বন্ধু প্রাণপণে দৌড়ানো শুরু করাতে অন্য বন্ধুটা বলে, "একটা ভাল্লুকের সাথে পাল্লা দিতে পারবি না তুই।" উত্তরে অন্যজন

বলে, "ভাল্লুকের সাথে কে পাল্লা দেয়, আমি তোর আগে থাকতে পারলেই হল।"

"উঠে পড়," আমি ওপিককে বললাম।

কথা শুনল ও।

নৌকার অন্য পাশে চলে গেলাম, আমার ইচ্ছে বৈঠাটা দিয়ে একটা বাড়ি মেরে ভয় দেখাব ওটাকে। কিন্তু তার চেয়েও একটা ভালো বুদ্ধি মাথায় আসল এ সময়। নৌকার ভেতর ওটার খোঁজে হাতড়াতে লাগলাম। এরপর ওটা নিয়ে আবার ফিরে এলাম আগের জায়গায়।

ল্যাসি গুঙিয়ে উঠল। প্রথমে ভাবলাম হয়ত আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে ওরকম করছে। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ওর যাবতিয় চিন্তা আমার হাতের মধুর বোতলটাকে নিয়ে।

যতটা সম্ভব মধু বের করে বোতলটার আশেপাশে মাখলাম। এরপর ওটা ছুঁড়ে মারলাম ভাল্লুকটার উদ্দেশ্যে।

বোতলটা ধরতে পারল নাকি সেটা দেখার পেছনে সময় নষ্ট করলাম না। পেছনে ঘুরে সর্বশক্তি দিয়ে নৌকাটা ঠেলতে লাগলাম। এক চুলও নড়ল না।

ঘুরে তাকালাম। ভাল্লুকটা মধুর বোতলের ওপর ঝুঁকে আছে, বিশ ফিট দূরে। আবার ধাক্কা দিলাম। এবার দুই ইঞ্চি নড়ল বলে মনে হল। ওপিকের হাবভাব দেখে মনে হল নেমে সাহায্য করতে চাচ্ছে।

হাত দিয়ে থামার নির্দেশ দিলাম, "ভেতরেই থাক।"

পেছনে তাকালাম আবার।

ভাল্লুকটা দুই পায়ে খাড়া হয়েই তাড়া করা শুরু করল।

চিৎকার করে উঠলাম।

ধাক্কা দিতে লাগলাম প্রাণপণে। এবার নৌকাটা সামনে এগোতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বালুর ওপর দিয়ে মসৃণ ভঙ্গিতে গড়াতে লাগল। শেষ পাঁচ ফিট যাওয়ার সময় পেছনে গাছের ডাল ভাঙার আওয়াজ কানে আসলো। এরপর লাফ দিয়ে নৌকায় উঠে গেলাম।

3:21 AM

ল্যাসি আমার হাত চেটে স্বান্ত্বনা দিচ্ছে।

"ধন্যবাদ।"

জবাবে ও আমার চেহারার দিকে তাকালে আবারো বুঝতে পারলাম, আমার ভালো থাকা না থাকা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয় সে। বরং আমার হাতে লেগে থাকা মধুর দিকেই যাবতিয় মনোযোগ।

হারামি কোথাকার।

ওপিক নৌকার পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। "অন-রে," আমাকে ওর দিকে যাওয়ার ইশারা করে বলল। জিনিসপত্র সরিয়ে ওর কাছে পৌছুলাম। নৌকার একটা অংশ দেখাল ও যেখানে অনেকটা চলটে উঠে গেছে।

"আকলার্ক," বলল ও।

কিছুটা সময় লাগল বুঝতে। নৌকার গায়ে সমন্তারাল চারটা দাগ।

ওপিক ওর আঙুলগুলো গুটিয়ে থাবা দেয়ার ভঙ্গি করতে লাগল।

আকলার্ক।

মানে ভাল্লুক।

ভাল্লুকটা নিশ্চয়ই শেষ মুহূর্তে আমার উদ্দেশ্যে থাবা চালিয়েছিল। কিন্তু একটুর জন্যে ফসকে গেছি।

বুকটা ধকধক করতে লাগল।

আরেকটু হলে গেছিলাম আজকে। আর প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় আসল : এই কাহিনী ইনগ্রিডকে বলতেই হবে।

3:21 AM

তিনটা তেপ্পান্নর সময় খাবারগুলো ভাগ করে খেলাম।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় পশমি কোটটা মাথার নিচে রেখে শুয়ে পড়লাম।

তিনটা ছাপ্পান্নয় আমার বুকের ওপর উঠে আসল ল্যাসি।

তিনটা সাতান্নয় নৌকাটা ডোবা শুরু করল।

"এত পানি কোথা থেকে আসছে?"

প্রথমে আস্তে আস্তে পানি উঠছিল, এখন অনেক জোরে উঠছে। ওপিক আর আমি ফুটোর খোঁজে নৌকার মেঝে পরীক্ষা করতে লাগলাম।

মিয়াও।

"নাহ, পানিতে লাফ মারব না আমরা," আমি বললাম। "ফুটোটা খুঁজে বের করে বন্ধ করতে হবে।"

তিরিশ সেকেন্ড পরে একটা ছোট গর্ত খুঁজে পেলাম দুটো কাঠের বোর্ডের মাঝে। "এখানে!" এক পা দিয়ে ফুটোটা জোরে ঢাকতে ঢাকতে

বললাম। জোরে একটা আওয়াজ হয়ে আমার পা নৌকার তলা ভেদ করে চলে গেল। একটা বিরাট গর্ত সৃষ্টি হল ঐ জায়গায়।

পানি আগের চেয়ে আরো বেশি বেগে ঢুকতে লাগল ভেতরে। পা'টা গর্ত থেকে তুলে বৈঠা নিয়ে নিলাম ওপিকের কাছ থেকে। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিলাম তীরের দিকে। আমরা তীর থেকে পঞ্চাশ ফিট দূরে আছি এখন। আর আমার হাতে এক মিনিটেরও কম সময় আছে। এরপর কাটা কলাগাছের মত পড়ে যাব।

বৈঠা জোরে জোরে চালাতে লাগলাম। "ল্যাসিকে ধর," ওপিকের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম।

বিভ্রান্তের মত আমার দিকে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা।

"পুসি!"

এবার ল্যাসিকে তুলে নিল ওপিক।

আর অল্প দূরত্ব বাকি আছে। নদীর স্রোত আমাদের সাহায্য করছে কিন্তু আর তিনবার বৈঠা মারার পরেই নৌকার সামনের দিকের নাকটা ডুবে যেতে লাগল।

"যাও!"

অর্ধেক ডুবে গেছে নৌকা। যেকোন সময় পুরোটা ডুবে যাবে।

ওপিক ল্যাসিকে নিয়ে তীরের ঝোপঝাড়ের ওপর লাফিয়ে নেমে গেল। আমি ওর হাতে বৈঠা আর পশমি কোটটা তুলে দিলাম। আরেকবার পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিলাম, ম্যাপটা নিরাপদ আছে। এরপর লম্বা ঘাসের উদ্দেশ্যে ঝাঁপ দিলাম।

পেছনে তাকিয়ে দেখলাম নৌকার শেষ ইঞ্চিটাও ডুবে গেল পানিতে।

অধ্যায় ১২

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
সূর্যোদয়–৩:২৩

কারো ফোঁপানোর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল।

চোখ খুলে আশেপাশে নজর বোলাতে লাগলাম। বিশ ফিট দূরে একটা গাছের পাশে ল্যাসি আর ওপিক বসে আছে।

এরকম আওয়াজ আগেও শুনেছি। ল্যাসি দুঃস্বপ্ন দেখার সময় এরকম শব্দ করে সাধারণত। প্রায়ই ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার বুকের ওপর থেকে এরকম আওয়াজ আসছে। ল্যাসি চোখ বন্ধ করে ফোঁপাচ্ছে।

ওদের দু-জনের কাছে গিয়ে বসে পড়লাম। কিন্তু ল্যাসিকে দেখলাম আরামসে ঘুমাচ্ছে।

ওপিক হাটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। থেকে থেকে পুরো শরীর কেঁপে উঠছে।

আমি একটা গর্দভ। একবারও মাথায় এটা এলো না যে, ফোঁপানোর আওয়াজটা ওপিকও করতে পারে। আসলে এতদিনে সব প্রতিকূলতার মাঝেও ওর অমন সাহস দেখে ধরে নিয়েছিলাম কোন কিছুতেই বিচলিত হয় না ছেলেটা। এটা আমার মাথাতেই আসেনি, ওপিকও ওর মা-বাবা আর ভাইবোনদের শূন্যতা অনুভব করতে পারে।

আস্তে করে একটা হাত ওর কাঁধে রাখলাম।

"কি হয়েছে বাবু?"

জবাবে নাক টানার আওয়াজ ভেসে আসল কেবল।

"আমার দিকে তাকাও তো একটু," ওর মাথাটা তোলার চেষ্টা করে বললাম।

কিন্তু ও আগের অবস্থাতেই রইল।

"সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আমরা ফিরে যেতে পারব এক সময়।"

আমি জানি ও আমার একটা কথাও বুঝবে না। আর বুঝতে পারলেও কতটা বিশ্বাস করত তাতে আমার কথা সন্দেহ আছে। কিভাবে বিশ্বাস করবে একজন মানুষের কথা যে কিনা দিনে মাত্র ষাট মিনিট সময় দেয় ওকে আর ওর কষ্ট করে জোগাড় করা খাবার দিয়েই গত এক সপ্তাহ পার

করেছে। তবুও বলতেই হত কথাগুলো, কারণ কেন জানি না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কথাগুলো বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে আমার।

হাত দিয়ে ওর মাথাটা তুললাম।

বাধা দিল আমাকে, ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে আছে বেচারার।

ওর কান্নারত চেহারা আমাকে দেখাতে চায় না। এস্কিমো সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব একটা জানা নেই আমার, কিন্তু এটা নিশ্চিত, পৌরুষত্বকে অনেক বড় করে দেখা হয় সেখানে। এরকম দুর্গম পরিবেশে দিনাতিপাত করা একটা জাতির জন্যে সেটাই স্বাভাবিক।

বেশ খানিকক্ষণ ওর পাশে বসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলাম। কয়েক মিনিট পর মাথা তুলল ও। চোখের চারপাশ ফুলে আছে। সুন্দর বাদামি চোখজোড়া রূপালি বর্ণের দেখাচ্ছে এই আলোছায়ার খেলায়।

"কান্নার মধ্যে কাপুরুষতার কিছু নেই," ওকে বললাম। "আমি তো সবসময়ই কাঁদি।"

আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

দু-হাত চোখের কাছে নিয়ে নাক টেনে টেনে কান্নার অভিনয় করে দেখালাম।

ছোট্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল ছেলেটার মুখে।

ল্যাসি জেগে উঠে ওপিকের কোলে চড়ে বসল। গাল থেকে চোখের পানিগুলো চেটে চেটে পরিস্কার করে দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পরে একটু স্বাভাবিক হল ওপিক। যদিও চোখের দিকে তাকালে অসহায় একটা ভাব নজরে পড়বে। ল্যাসির চোখেও একই প্রতিফলন দেখলাম। যেন আমাদের সব আশা ভরসা নৌকাটার সাথে ডুবে গেছে। আমারটুকু ডুবে গেছে এটা জানি।

কিন্তু একটা কথা মনে পড়ল এ সময়।

ক্যানোটার কথা তো ভুলেই গেছিলাম!

3:21 AM

ইনগ্রিড আর আমি একবার পিকশনারি খেলেছিলাম। এই খেলায় আপনাকে একটা সূত্র দেয়া হলে ওটা এঁকে অন্যজনকে বোঝাতে হবে। কিন্তু আমার আঁকার হাত একেবারেই জঘন্য, কারণ কোন স্কুলের আর্ট ক্লাসে যাওয়া হয়নি আমার। একটা জিনিসই ঠিকমত আঁকতে পেরেছিলাম, স্টক মার্কেটের গ্রাফের ছবি।

তাই একবার যখন আমার চিরকুটটায় লেখা দেখলাম 'হাঁচি' তখন কল্পনাও করতে পারছিলাম না, কী করব, কীভাবে আঁকব। রাগের মাথায় ইনগ্রিড ওর সব কাপড়...থাক সে অন্য কথা।

তো, এবার যখন বালিতে একটা ক্যানো আঁকার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম তখন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম, অন্তত হাঁচি থেকে সোজা হবে এটা আঁকা। কিন্তু অবস্থা বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না।

ওপিক বেশ খানিকক্ষণ আমার আঁকা ক্যানোটার দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। বুঝতে পারছে না।

"এটা একটা ক্যানো," পঞ্চমবারের মত ওকে বললাম, "ক্যা-নো।"

মিয়াও।

"না, এটা কলা না।"

হাত দিয়ে মুছে আবার শুরু থেকে আঁকলাম।

আমার মাথায় পরিস্কার ক্যানোটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আঁকতে গেলেই সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।

মিয়াও।

"মারডকেরটার মতন মানে?"

মিয়াও।

"বদ কোথাকার!"

ওপিক আমার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে নিল। আমি দেখতে লাগলাম ও দক্ষ হাতে একটা ক্যানোর ছবি আঁকল বালুতে। বৈঠা হাতে দু-জন আরোহিসহ।

"ক্যা-নেউ," ও বলল।

আমি মাথা নেড়ে সায় জানালাম।

3:21 AM

আমরা যখন পচিশ মাইল দূরে ক্যানোটার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম তখনও আবছা অন্ধকার চারপাশে। বিশ মিনিট পরে ফের বালুতটের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। বাকিটা সময় প্রায় দৌড়ে এগোলাম, এরপর ক্যাম্প করার জন্যে থামলাম। যে পাউডারগুলো মশাদের দূরে রাখে ওগুলোর কার্যক্ষমতা কমে যাওয়ায় মশারা ইচ্ছেমত কামড় বসাতে লাগল আমাকে।

কিছুক্ষণ পর মশাদের ভিড় একটু কমলে ওপিকের কাছে অনুনয় করতে লাগলাম আবার ঐ পাউডারের ব্যবস্থা করার জন্যে।

কিন্তু মাথা নেড়ে না করে দিল ও।

একবারের বেশি ওটা লাগাবে না, কোন ধরণের কুসংস্কার হবে হয়ত। জানতেও পারলাম না কোন গাছের পাউডার।

ঘুমিয়ে পড়ার কিছুক্ষণ আগে ওপিককে মাছ ধরতে দেখার সৌভাগ্য হল আমার। প্রথমে লাঠি দিয়ে কয়েক জায়গায় ছোয়া দিল, এরপর গায়ের জোরে বাড়ি বসাল। আমার ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত অবশ্য কোন মাছ ধরা পড়ল না। কিন্তু ঘুম থেকে উঠে দেখব, আমার জন্যে দুটো মাছ ঠিকই অপেক্ষা করছে।

আমার ধারণা ঠিক প্রমাণিত হল।

আমার হাতের ওপর মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা। আর এক হাত দিয়ে ল্যাসির লেজ ধরে রেখেছে। উঠে বসতে চাইলাম, কিন্তু ওকে তখনই জাগাতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ দেখতে লাগলাম ওর ছোট বুকটা ঘুমের তালে ওঠা নাম করছে। আরো পাঁচ মিনিট পরে দু'জনকে ডেকে তুললাম ঘুম থেকে।

আমার হিসেব অনুযায়ি ইয়োকু আর তানানা নদীর মিলনস্থলে পৌছুতে আর দশ মাইল পাড়ি দিতে হবে আমাদের। এরপর ওখান থেকে ক্যানোর কাছে পৌছুতে আরো আট নয় মাইল।

খেতে খেতেই দৌড়োতে লাগলাম আমরা।

এর পরের দিনটাও একই রকম গেল। একটাই পার্থক্য–আগের দিনের চেয়ে তিন মিনিট কম সূর্যালোক।

তৃতীয় দিনে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

ল্যাসির ভাষ্যমতে আমি ঘুমিয়ে পড়ার বারো ঘন্টার পর থেকে ঝড় শুরু হয়। এর এক ঘন্টা পর থেকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে।

ভাগ্যিস বালুতটে উঁচু জায়গায় ঘুমিয়েছিলাম আমি। না-হলে নদীর বাড়তি পানি ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারত আমাকে। পানির উচ্চতা আগের দিনের চেয়ে তিন ফিট বেড়ে গেছে দেখলাম, আর আগের দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হচ্ছে স্রোত।

এই বৃষ্টির থেকে মাথা বাঁচানোর মত কোন আশ্রয়ই নেই আশেপাশে। মাছ ধরা আর ফল সংগ্রহ করাও অসম্ভব। পুরো দিন না খেয়ে থাকতে হল।

৩ জুলাই
সূর্যোদয় ৩:৩২

ভারি বর্ষণের কারণে ঝোপঝাড়গুলোর অবস্থা একদম করুণ। ওপিক যে কয়টা ফল খুঁজে পেল সবগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে, আর না-হলে চেনা যাচ্ছে না। নদীর পানি এত ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যে, মাছ ধরার সুযোগও পাচ্ছে না ছেলেটা।

আমিষের স্বল্পতার প্রভাব টের পাচ্ছি। বুকের প্রতিটা পাঁজর হাত দিয়ে গুণতে পারি আমি। ওগুলোর ওপর দিয়ে মসৃণভাবে আঙুল বোলানো যায় না, আটকে যায়। আমার ট্রাউজার ঢিলে হয়ে যাওয়াতে শক্ত করে বেধে রেখেছি। তা-ও মাঝে মাঝে কোমর থেকে নেমে যাওয়ার অবস্থার সৃষ্টি হয়। আলাস্কার বুনো অঞ্চলে এগার দিন কাটানোর পরে আমার ওজন প্রায় পনের পাউন্ড কমে গেছে।

গত দিন বৃষ্টির মাঝে হাঁটার মধ্যেই তানানা আর ইয়োকু নদীর মিলনস্থল পেছনে ফেলে এসেছি। এবার বুঝেছি গতবার কেন চোখে পড়েনি। ওখান দিয়ে ঘন হয়ে জন্মেছে ঘাস। ভালো মত না তাকালে বোঝাই যায় না অন্যপাশে কি আছে।

বৃষ্টি তুলনামূলক কম হওয়াতে ইয়োকু নদীর পানিও কমে গেছে। ফলে আবার বালুতটের ওপর দিয়ে দ্রুতবেগে হাঁটতে পারছি আমরা।

ল্যাসি আমার হাতে থাকে আর ওপিক পেছন পেছন পেছন দৌড়ায়। মাঝে মাঝে কিছু সময়ের জন্যে ল্যাসিকে ওপিকের কোলেও দেই। সবসময় এই আশায় থাকি যে কখন ঐ তিনটা পাথর আর উল্টিয়ে রাখা ক্যানোটা চোখে পড়বে।

তিনটা চল্লিশের সময় পাহাড়ের ওপাশ থেকে সূর্য বেরিয়ে এল।

এক মাইল পর থামলাম আমি।

"ওখানে," এই বলে হাতের বৈঠাটা দিয়ে বাঁকের অন্যপাশের তিনটা পাথরের দিকে দেখালাম।

কিন্তু কী যেন একটা অন্যরকম লাগছে।

ক্যানোটা।

চিহ্নও নেই ওটার।

3:21 AM

"নদীতে ভেসে গেছে," বলতে লাগলাম, "ভেসে গেছে।"

এখন পাথরগুলোর প্রায় পনের ফিট নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী। কিন্তু ভারি বর্ষণের ফলে নিশ্চয়ই উচ্চতা বেড়ে গেছিল বহুগুণে। এটা আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল আমার। কিন্তু আসেনি, অতিরিক্ত আশাবাদি আমি!

ওপিক একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওখানেই ক্যানোটা রেখেছিলাম আমি দু'সপ্তাহ আগে। বেচারার মাথায় কি ঘুরছে কে জানে? হয়ত আমার মাথায় যা ঘুরছে সেটাই, আবার আগের অবস্থাতেই ফেরত গেছি আমরা। নাকি একশ চল্লিশ মাইল দূরের ইন্ডিয়ান গ্রামটার কথা ভাবছে?

ম্যাপটা খুলে সামনে বিছালাম।

এর এক মিনিট পরে একটা কাঠি নিয়ে বালিতে লেখা শুরু করলাম।

হারিয়ে গেছি। আজ ৩ জুলাই। এখন নদীর পার ধরে ফেয়ারব্যাঙ্কসের দিকে রওনা হচ্ছি। হেনরি বিনস, ল্যাসি আর ওপিক।

লেখা শেষ করে বললাম, "চল, আবার শুরু করা যাক।"

অধ্যায় ১৩

৪ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৩৫
বাংলাবুক্স ডিরেক্ট লিঙ্ক

ঘুম থেকে উঠে শুনি ল্যাসি তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর ওপিকের মুখ আমার থেকে এক ইঞ্চি দূরে। এর আগের দিন বিশ মিনিটের মত দৌড়ানোর পর বালুতটে ঘুমোনোর জন্যে ভালো একটা জায়গা বের করে ক্যাম্প করি আমরা।

"কি হয়েছে?" লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলাম। "বল্লা হরিণ? নাকি ভাল্লুক?"

মিয়াও।

"তোরা খুঁজে পেয়েছিস ওটাকে?"

মিয়াও।

"ক্যানোটার সন্ধান পেয়েছিস তোরা?" ল্যাসির উদ্দেশ্যে এটা বলে ওপিককে কোলে তুলে নাচতে লাগলাম। গতদিন একারণেই ইয়োকু নদী ধরে এদিকটায় রওনা হয়েছিলাম। স্রোতের টানে নৌকাটা ভেসে এদিকে আসার সম্ভাবনাই বেশি। কিনারার ভাসমান গাছের গুড়িগুলোর সাথে আটকে থাকতে পারে ওটা।

অন্তত একবারের জন্যে হলেও তো ভাগ্য আমাদের সহায় হল!

দ্রুত ক্যাম্প গুটিয়ে ইয়োকু নদী ধরে দৌড়াতে লাগলাম আমরা। এখনও অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি চারপাশে। সূর্য উঠতে আরো প্রায় তিরিশ মিনিট। তবে এই হালকা আলোতেও নদীর অপর তীরে ক্যানোটা দৃষ্টি এড়াল না।

বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ না করে কাপড়চোপড় খুলে, শুধুমাত্র আন্ডারওয়্যারটা পরে পানিতে ঝাঁপ দিলাম, হাতে বৈঠাটা। পানি একদম ঠান্ডা। হাড্ডি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে অপর পাড়ে পৌছানোর জন্যে সাঁতার কাটতে লাগলাম।

প্রায় আধমাইল সাঁতরে অন্যপাশে পৌছে ক্যানোটা যেখানে আটকে আছে সেখানে দৌড়ে গেলাম। পাঁচ মিনিট লাগল ঝোপঝাড় থেকে ওটাকে

মুক্ত করতে, আরো পাঁচ মিনিট লাগল বৈঠা মেরে ওটাকে এপাশে নিয়ে আসতে। ল্যাসি আর ওপিক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

ঘড়িতে এখন তিনটা আটাশ।

ঠান্ডায় আমার হাত পা কাঁপছে। ওপিক দ্রুত আমার গায়ে কেবিন থেকে সংগ্রহ করা পশমি কোটটা চাপিয়ে দিল।

দশ মিনিটের জন্যে উধাও হয়ে গেল ছেলেটা। যখন ফিরে আসল তখন হাত ভর্তি বাদাম। মাথা নেড়ে বোঝাল এটুকুই জোগাড় করা সম্ভব হয়েছে ওর পক্ষে।

আমাদের মধ্যকার ভাব প্রকাশের ধরণটা আসলেও অদ্ভুত। আমি মাত্র দশদিন ধরে আছি ছেলেটার আশেপাশে, তবুও ও যখন হাত পা নেড়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে বোঝাল, তুমি এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও, আমি দেখি কিছু খাবার জোগাড় করতে পারি কিন, এরপরে আলো ফুটলে ক্যানোতে চড়ে রওনা হব আমরা–বুঝতে অসুবিধা হয়নি।

তিনটা বিয়াল্লিশের সময় সূর্যের সোনালি আভায় যাত্রা শুরু করলাম আমরা।

৫ জুলাই
সূর্যোদয় ৩:৩৯

পরের দিন যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখনও আমরা ইয়োকু নদীতে। ওপিকে ক্যানোর পেছনের সিটটাতে বসে আছে, হাতে বৈঠা। ওর কাছে গিয়ে বৈঠাটা আমাকে দেয়ার জন্যে ইশারা করলাম।

"একটু বিশ্রাম নাও তুমি।"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ও।

আশেপাশে তাকিয়ে একটু অবাক হলাম। নদীর প্রস্থ বেড়ে গেছে আগের তুলনায় প্রায় তিনগুণ। ঠিক মাঝখান দিয়ে চলছে ক্যানোটা। কিন্তু অন্য কোন মানুষের চিহ্ন চোখে পড়ল না। না কোন আগুন, না কোন মাছ ধরার নৌকা।

একদম একা আমরা। ভাবতে লাগলাম ওপিক আর ল্যাসি কোন এক পর্যায়ে ক্যানোটা তীরে ভিড়িয়েছিল কিনা। একটু পরেই উত্তর পেয়ে গেলাম যখন ওপিক আমার দিকে অনেকগুলো বাদাম আর ফলমূল বাড়িয়ে দিল। দ্রুত খেয়ে নিয়ে ওকে বললাম, "এবার ঘুমোও একটু।"

মাথা নাড়ল ও জবাবে। আমার কোলে এসে বসল ল্যাসি।

"তোদের চোখে উদ্ধার পাবার মত কিছু পড়েনি তাহলে গতকাল।"

মিয়াও।

"আচ্ছা। তুই ঠিক আছিস?

মিয়াও।

"ওহ্, ডায়রিয়া।"

লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। আসলে আমি অবাকই হয়েছি, পেটের অসুখ হতে এত সময় লাগল। প্রথম দু-দিন সরাসরি নদীর পানি খাওয়ার পর ভেবেছিলাম তখনই অসুবিধা হবে কিন্তু কিছুই হয়নি। এরপরে তো ওপিকের পদ্ধতিতে পানি খেয়েছি আমরা, যা মোটামুটি নিরাপদই বলা চলে। আমার মনে পানি থেকে না, অন্য কোন খাবার থেকে এরকমটা হয়েছে। হয়ত আমি ঘুমন্ত থাকা অবস্থায় ডাঙায় নেমে কিছুতে মুখ দিয়েছিল ও কিংবা আসলেই কিছু একটা হয়েছে।

আমার কথা প্রমাণ করতেই যেন বমি করা শুরু করল ল্যাসি। বমি করে কিছুক্ষন আমার দিকে বিহ্বলের মত তাকিয়ে থাকল।

আলেক্সান্দ্রিয়ায় থাকলে এতক্ষণে ওকে নিয়ে স্কুটারে করে পশু ডাক্তারের উদ্দেশ্যে রওনা হতাম।

ওকে সাহায্য করতে পারব না আমি এ মুহূর্তে, কিন্তু ইন্ডিয়ান গ্রামটায় পৌছানোর আগ পর্যন্ত সাহস জোগাতে পারব। ওকে কোলে তুলে নিলাম।

আস্তে আস্তে গোঙাতে লাগল বেচারা।

"কালকেই সাহায্য খুঁজে পাব আমরা, দেখিস।"

মিয়াও।

"সুযোগ হল না? কিসের সুযোগ?"

মিয়াও।

"মেরু শিয়ালের সাথে কি?"

মিয়াও।

"তুই আর ঠিক হলি না," একমাত্র ল্যাসির পক্ষেই এমন পরিস্থিতিতে এই কথা ভাবা সম্ভব।

ওপিকের দিকে তাকালাম। শান্ত ভঙ্গিতে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা।

নিচু হয়ে ঝুঁকে মুখটা ওর কানের কাছে নিয়ে আস্তে করে বললাম, "আমার আর ইনগ্রিডের ছেলেটা যেন একদম তোমার মত হয়।"

ভূমিকম্পের পরে ঠিক আছে তো ইনগ্রিড আর আমাদের বাচ্চাটা?

3:21 AM

এরপরের আধা ঘন্টা বৈঠা বাইলাম দ্রুতগতিতে, আর আশেপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাতে লাগলাম।

পৌনে চারটার সময় নদীর দক্ষিণ তীরে নৌকা ভিড়ালাম এই আশায় যে, বালুতটের দেখা পাব, কিন্তু গিয়ে দেখি কেবল বুনো ঝোপঝাড়।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় ওপিককে ডেকে তুললাম।

"এবার তোমার পালা।"

হেসে আমার হাত থেকে বৈঠাটা নিয়ে নিল ও।

আমি তীরের দিকে দেখালে মাথা নাড়ল।

সামনে বালুতট চোখে পড়লে নৌকা ভিড়িয়ে বিশ্রাম করবে।

হাত দিয়ে পানিতে বাড়ি মারার ভঙ্গি করে দেখালাম।

"ফিশি!" হেসে বলল ও।

নিচু হয়ে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

অধ্যায় ১৪

৬ জুলাই
সূর্যদোয়–৩:৪৩

ঘুম থেকে জেগে দেখি পুরোপুরি ভিজে গেছি আমি।

ঠান্ডায় কাঁপতে লাগলাম। হাত দিয়ে মুখ ঢেকে উঠে বসলাম আমি।

একটা বিশাল ঢেউয়ের ওপর উঠে গেল নৌকাটা। পরমুহূর্তেই পড়ে গেল নিচে। আবার পানির ঝাপটা এসে ভিজিয়ে দিল পুরো শরীর। নৌকার ভেতরেই তাল হারালাম।

ভয়ানক দুলছে ক্যানোটা, মনে হচ্ছে উল্টেই যাবে।

আবার উঠে বসলাম।

ওপিক ভয়ে গুটিয়ে আছে, আতঙ্কে চোখজোড়া বড় বড় হয়ে গেছে। ওর পাশে বসে থাকা ল্যাসিরও একই অবস্থা।

"কি হচ্ছে–"

ঠিক এই মুহূর্তে আরেকটা ঢেউ আছড়ে পড়ল আমাদের ওপর। কোনমতে সোজা হয়ে ভেসে থাকল নৌকাটা।

শক্ত করে ক্যানোর পাটাতন ধরে বসে থাকলাম। নদীর একটা সরু অংশ দিয়ে যাচ্ছে নৌকাটা। আমরা এখন পুরোপুরি ঢেউ আর পাথরের মর্জিতে আছি। একজন দক্ষ গাইডকেও এই দুর্গম অংশ দিয়ে নৌকা চালানোর সময় কয়েকবার ভাবতে হত।

কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে। ওপিকের দিকে ফিরে তাকালাম।

"বৈঠাটা কোথায়?"

জবাবে মাথা ঝাঁকাল ও।

নেই।

বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে ঘুরে বসলাম। আরেকদফা বিরাট ঢেউ এসে ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

পাঁচ সেকেন্ড পরে হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল নদীটা।

পরের সোয়া মাইলের মত শান্তই থাকবে মনে হয়। কিন্তু তবুও ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।

"ল্যাসি তুই ঠিক আছিস," আমার দুই সহযাত্রির দিকে নজর দিতে দিতে বললাম।

পুরোপুরি ভিজে গেছে ও। কাঁপছে। দেখে মনে হচ্ছে, ওজন দুই পাউন্ডও হবে কিনা সন্দেহ।

"তোর কি এখনও শরীর খারাপ লাগছে?"

কোন উত্তর এল না।

মোটেও ভালো লক্ষণ নয় এটা।

ওপিক কাঁদছে। আমি জানি না বৈঠাটা কিভাবে হারিয়ে গেছে, কিন্তু সেটার জন্যে অপরাধবোধে ভুগছে ছেলেটা।

"ঠিক আছে, কোন ব্যাপার না। ওটুকু পার হয়ে এসেছি আমরা।"

আমি বৈঠার মত করে হাত দিয়ে পানিতে ধাক্কা দিতে লাগলাম। নদীর প্রস্থ এখানে কম। আমরা যদি তীরের পনের ফিটের মধ্যেও যেতে পারি, তাহলে একটা গাছের ডাল ধরে তীরে ভিড়তে পারব। ওখান থেকে একটা গাছের ডাল ভেঙে না-হয় বৈঠা বানিয়ে নিব।

"শিট!"

সামনে এই অন্ধকারের মধ্যেও ফেনা দেখা যাচ্ছে পানির ওপর।

তীরে ভেড়ার মত সময় নেই আমাদের হাতে।

"সামনের দিকে যাও," হাত নেড়ে জোরে নির্দেশ দিলাম ওপিককে।

সামনের বসার জায়গাটাতে চলে গেল ও।

আমি পেছনের দিকে থাকলে একটা ভারসাম্য থাকবে এই ভেবে পেছনে গিয়ে বসলাম দ্রুত। একহাতে ল্যাসির কলার ধরে রেখেছি। বললাম, "শক্ত করে ধরে বস।"

ঠিক এই সময়ে দুটো পাথরের ভেতরে ঢুকে গেল নৌকাটা। জোরে বাড়ি খেয়ে তীব্র স্রোতের প্রভাবে সামনেই যেতে লাগল। বড় একট ঢেউ এসে ধাক্কা দিল নৌকাটাকে। ডানদিকে ঘুরে গেল সেটা, একটা পাথরের গায়ে বাড়ি খেল।

ওপিক তাল সামলাতে না পেরে উধাও হয়ে গেল নৌকা থেকে।

"ওপিক!"

ক্যানোটা লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এ সময়। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালাম। ওপিকের ছোট মাথাটা ভাসতে দেখলাম একবার। এরপর আবার ডুবে গেল।

হায় ঈশ্বর!

ক্যানোটা সামনে এগোতে লাগল। আমি ওপিকের খোঁজে পানিতে চোখ বোলাতে লাগলাম।

"কই গেল!"

অবশেষে আবার দেখতে পেলাম ওকে। আমাদের থেকে চল্লিশ ফিট বামে, অসহায়ের মত হাত ছুঁড়ছে। ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, কিন্তু পারছে না। এই বুনো অঞ্চলে টিকে থাকার সব পদ্ধতি জানলেও সাঁতার জানে না ছেলেটা।

একবার ল্যাসির দিকে তাকালাম, তারপর ওপিকের দিকে।

মিয়াও।

"অসম্ভব!"

মিয়াও।

"কিভাবে–

মিয়াও।

লাফ দিলাম ক্যানো থেকে।

দুই সেকেন্ড পরে ওপিকের শরীর আমার সাথে ধাক্কা খেলে ধরে ফেললাম ওকে।

ল্যাসিকে শেষবারের মত দেখলাম ক্যানোর ওপর থেকে অসহায়ের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

3:21 AM

যখন আমার বয়স চৌদ্দ বছর তখন একদিন বাবার সাথে লড়েছিলাম আমি। বাবা এখন যে বাসাটাতে থাকেন সেটারই ড্রয়িং রুমে। নাস্তা শেষ করে সেদিন কেবলই অংক করতে বসেছি, বাবা এটা ভালো মতনই জানেন যে প্রতিদিনকার জন্যে বরাদ্দ ষাট মিনিট থেকে বিশ মিনিট অঙ্ক করতে কতটা বিরক্ত লাগে আমার। তাই তিনি বলতেন আমি যদি কুস্তির লড়াইয়ে তাকে হারাতে পারি তাহলে আগামি দিনের 'স্কুল' থেকে আমার মুক্তি।

বেশ কয়েকবারই লড়েছি আমরা। কিন্তু প্রতিবারই ঐ ছোটখাটো মানুষটা মেঝেতে ধরে চেপে ধরতেন আমাকে আর গুনতেন, "এক হাজার এক...এক হাজার দুই...এক হাজার তিন!" এরপর বিজয় নৃত্য জুড়ে দিতেন।

এটা আমি জানতাম, আমাকে অল্পের ওপর দিয়েই পার পেয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু সেদিনকার লড়াইয়ে তিনি এটা জানতেন না, গত ছয়মাস ধরে

আমি ওনাকে অল্পের ওপর দিয়ে পার হয়ে যেতে দিচ্ছি। ঐ ছমাস আমি আমার 'ব্যক্তিগত' দশ মিনিট বুক ডন করে কাটিয়েছি। যদিও আমাকে দেখে কেউ বুঝবে না, কিন্তু স্বাস্থ্যের একটু হলেও উন্নতি হয়েছে। শক্তিও বেড়েছে।

আর সেদিনই সব অনুশীলন কাজে লাগিয়েছিলাম।

চুলোয় যাক বীজগণিত।

"এতদিন লুকিয়ে কি খাচ্ছিলে তুমি?" বাবা দুই মিনিট পরে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি হেসে তার প্যাঁচ থেকে বের হয়ে গেলাম।

এরপরের বাবার দুবারের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলাম অনায়াসেই। বুঝতে পারলাম , ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন তিনি।

তার ওপরে উঠে গেলাম, এরপর দুই পা দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে আটকে ফেললাম প্যাঁচে। নড়তেও পারছে না।

"তুমি কি আমাকে আটকে ফেললে নাকি?" বাবা মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলেন।

"ইয়েস স্যার," আরো শক্ত করে আটকে ধরে বললাম।

"এক হাজার এক...এক হাজার দুই...এক হাজার তি–"

শেষ মুহূর্তে এক ঝটকায় ছুটে গিয়ে আমাকে নিচে চেপে ধরলেন বাবা। এরপর ওপর থেকে বললেন, "তুমি কি আসলেও ভেবেছিলে আমাকে হারিয়ে দেবে?"

"ধুর," হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

আমার ওপর থেকে সরে যেতে লাগলেন তিনি। কিন্তু সরার সময় তার পুরো ভর গিয়ে পড়ল আমার ডান পায়ের পাতার ওপর। মট করে শব্দ করে ভেঙে গেল ওটা।

দশ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে পৌছে যাই আমরা। ডাক্তাররা হাড্ডি ঠিকমত বসিয়ে প্লাস্টার করে দেয়।

ততক্ষণে চারটা বেজে যায় আর পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি বিছানায়।

পায়ের সাদা প্লাস্টারের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠেছিলাম। আগেরদিন ভেবেছিলাম ওখানে সাইন করে দেয়ার মত কেউ নেই। কিন্তু বাবা সারা হাসপাতালে হুইল চেয়ারে করে ঘুরিয়েছিলেন আমাকে আর সবাইকে দিয়ে সাইন করিয়েছিলেন ওখানে।

কিন্তু ওপিকের কোন প্লাস্টার নেই সাইন করার মত।

পানিতে পড়ে যাবার পরে কোন এক সময় ওর পা নিশ্চয়ই শক্ত কোন পাথরের সাথে বাড়ি খেয়েছিল অনেক জোরে। বাম পাটা গোড়ালি থেকে বিশ ডিগ্রি বিশ্রিভাবে ঘুরে আছে। কিন্তু ওটুকুই সব নয়, পেটের কাছটাতে বিরাট একটা ক্ষতেরও সৃষ্টি হয়েছে। হা হয়ে আছে জায়গাটা, গলগল করে রক্ত পড়ছে।

আমি আমার টি-শার্ট ছিড়ে ওটা দিয়ে কেটে যাওয়া জায়গাটা চেপে ধরলাম।

ওপিক চিৎকার করে উঠল।

ঘড়িতে সময় দেখাচ্ছে তিনটা এগার।

উনপঞ্চাশ মিনিট।

আরো পাঁচ মিনিট ওর ক্ষতস্থানে টিশার্টটা চেপে ধরে রাখলাম। এরপরে সরিয়ে নিয়ে দেখি রক্তে ভিজে গেছে ওটা। এখনও সূর্যের আলো ফোটেনি। তবে এই অন্ধকারেও বেশ বুঝতে পারছি যে ক্ষতটা মারাত্মক। চামড়া ফেড়ে আছে, ভেতরে হাড্ডি পর্যন্ত ফুটে উঠেছে।

ওপিক চিৎকার করে উঠল ব্যথায়।

পায়ের ব্যথায় নাকি কাটা স্থানের জ্বালাপোড়ায় তা বুঝলাম না।

অসহায়ের মত লাগছে। কি করব কিছুই বুঝছি না।

ওকে জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া দরকার এখনই। পনেরটার মত সেলাই লাগবে আর পা-টাও ঠিকমত ঘুরিয়ে দিতে হবে। আর সবচেয়ে জরুরি ভিত্তিতে লাগবে ব্যথার ওষুধ।

কি কি করতে হবে মনে মনে ঠিক করে নিলাম।

ওপিকের হাতটা নিয়ে টিশার্টের ওপর রেখে বললাম, "চাপ দিয়ে রাখো!"

এরপর ওর পায়ের কাছে চলে গেলাম।

"ব্যথা করবে ভীষণ," বললাম ওর উদ্দেশ্যে।

এরপর জুতো ধরে ওর পা-টা ঘুরিয়ে দিলাম।

ওপিকের এবারের চিৎকারের কাছে আগের চিৎকারটা কিছুই না।

ওর পায়ের নিচে বালি দিয়ে দিলাম, যাতে উঁচু হয়ে থাকে ওটা।

"আমি জানি খুব ব্যথা করছে বাবু," ওর হাতে চাপ দিয়ে বললাম। "কিছু জিনিস জোগাড় করতে হবে আমাকে। এখনই আসছি!"

দাঁত চেপে কোনমতে মাথা নাড়ল ছেলেটা।

তিনটা বাইশ বাজছে।

দিনের আলো ফুটতে এখনও বিশ মিনিট। কিন্তু চলাফেরা করার মত যথেষ্ট আলো আছে। দশ মিনিট লাগল ঝোপটা খুঁজে বের করতে যেটার পাতা থেকে জেল বানিয়ে ল্যাসিকে লাগিয়ে দিয়েছিল ওপিক।

পাতাসহ দুটো ডাল তাড়াতাড়ি ভেঙে নিলাম। এরপর আরো শক্ত দেখে গাছের ডাল খুঁজতে লাগলাম যেটা থেকে লাঠি বানানো যাবে।

ওপিকের কাছে বালুতটে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে সময় তিনটা তেতাল্লিশ।

বাচ্চাটা এখনও কাঁদছে।

এখনও চিৎকার করছে।

দুটো লাঠি ওর ভাঙা পা'টার দুপাশে রেখে জুতোর ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিলাম। তাহলে নড়াচড়া কম হবে। পাগলের মত কাতরাচ্ছে ছেলেটা।

এরপর পাতাগুলো ছিড়ে পানিতে ভিজিয়ে হাত দিয়ে পিষতে লাগলাম যতক্ষণ না জেলের মত পদার্থ না বের হয়।

ওপিকের ক্ষতস্থানটা থেকে টি-শার্টটা সরিয়ে পানি দিয়ে পরিস্কার করে দিলাম। সূর্যের আলোয় এখন ওটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। চার ইঞ্চির মত হা হয়ে আছে জায়গাটা। হাতের জেলগুলো আস্তে করে ওখানে লাগিয়ে দিতে থাকলাম। প্রতিবার হাত ছোঁয়ানোর সাথে চিৎকার করে উঠছে ছেলেটা। কিন্তু এখন একটু নেতিয়ে পড়েছে।

তিনটা পঞ্চান্নর সময় ওর মাথাটা আমার কোলের ওপর নিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

"ঠিক হয়ে যাবে, বাবু।"

দুই মিনিট পরে কান্না বন্ধ হয়ে গেল ওর।

অধ্যায় ১৫

বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক
৭ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৪৭

সূর্য আর মশা দুটোই ঝাল মিটিয়েছে আমার খোলা পা-টার ওপর। বালিতে উঠে বসতে বসতে চুলকে নিলাম জায়গাটা। ওপিক যেখানে শুয়ে আছে সেদিকে গেলাম। ওর বাম পা ফুলে আছে বেঢপভাবে। কালচে নীল হয়ে আছে ওপরের আকাশের মত।

ওর পাশ থেকে বালিতে গভীর একটা দাগ শুরু হয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওটা দেখে বুঝলাম এক পর্যায়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ওখানে গেছিল ছেলেটা। কতটা কষ্ট সহ্য করে কাজটা করতে হয়েছে ভাবতেই খারাপ লাগল। অথচ পাশেই কাজ সারতে পারত ও।

এরপরে কিছুক্ষণ খাবারের খোঁজে হন্য হয়ে ঘুরলাম। কিন্তু অল্পসংখ্যক বেরি ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। ওখান থেকে দুটো নিজের জন্যে রেখে বাকিটুকু ওপিককে খাওয়াতে লাগলাম। চোখ বন্ধ করে গিলতে লাগল ও। বালিতে গর্ত করে ওখান থেকে একটু একটু করে পানি নিয়ে খাওয়ালাম ওকে। তারপর কোলে করে লম্বা একটা পাথরের পাশে নিয়ে গেলাম ওকে। ওর ওজন মাত্র চল্লিশ পাউন্ড। কিন্তু আমার এই দূর্বল অবস্থায় ওটাকেই একশ কেজি বলে মনে হচ্ছে।

একটা লাঠি নিয়ে নদীতে নেমে পড়লাম। ওপিক যেভাবে মাছ ধরে সেভাবে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুই পেলাম না।

৮ জুলাই
সূর্যোদয়–৩:৫১

ইনগ্রিডের সাথে বসে কেবিনের বারান্দা থেকে প্রথমবারের মত সূর্য দেখার দিনটাকে এখন মনে হচ্ছে কয়েক যুগ আগের ঘটনা। সূর্যের মাহাত্ম্য তখনও ঠিকমতো বুঝিনি আম। হ্যা, আমার সাদাকালো জীবনকে সেদিন কিছুটা রঙ্গিন করেছিলো ঠিকই, কিন্তু এই কয়দিনে আলাস্কার এই বুনো অঞ্চলে দিনাতিপাত করে ওটার গুরুত্ব আরো ভালোমত বুঝতে পেরেছি

আমি। এই সূর্যালোকের কারণেই বেড়ে উঠেছে গাছগুলো, যার ফল খেয়ে বেঁচে আছি আমি।

আমার দেখা সূর্যের শেষ আলোটুকু প্রাণ ভরে উপভোগ করতে ইচ্ছে করছে। কারণ কাল থেকে আমার জাগ্রত থাকা অবস্থায় আর সূর্যের দেখা পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি পারছি না উপভোগ করতে। কারন এই সূর্যের আলোতেই ওপিকের ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে। ইনফেকশন হয়ে গেছে ওখানে। আস্তে করে হাত রাখলাম ওর কাঁধে। ওর চিৎকারের মাঝেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৮ জুলাই
সূর্যোদয়, ৩:৫৮

পাথরদুটো সজোরে বাড়ি লাগালাম। একবার স্পার্ক করল কিন্তু ঘাসে আগুন জ্বলল না। আবার চেষ্টা করলাম। আবার। আবার। হাত থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

আবার ঘষা দিলাম জোরে।

"জ্বল্, জ্বল্!"

এবার একটা ঘাসে আগুন ধরল। ওর ওপর আরো কিছু শুকনো ঘাস ছড়িয়ে দিলাম। ওগুলোও জ্বলতে লাগল। এর কিছুক্ষণ পরে গাছের ডালটা সাবধানে রাখলাম আগুনের ওপর। ফুঁ দিতে লাগলাম। ওটাতেও ধরল আগুন। এরপর আশেপাশে থেকে জোগাড় করা সবগুলো ডালপালা একে একে ছড়িয়ে দিলাম আগুনের ওপর।

দুই মিনিট পরে দাউদাউ করে জ্বলতে লাগলো ওগুলো। দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত টিকতে হবে এই আগুনকে।

ওপিকের পাশে যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখনও জ্বলছে আগুন।

১০ জুলাই
সূর্যোদয়, ৪:০০

ওপিকের কপাল থেকে কালকের ঐ আগুনের মতই উত্তাপ ছড়াচ্ছে। ঐ আগুন দেখে কেউ উদ্ধার করতে আসেনি আমাদের। গত দু-দিনে আমরা কেউই কিছু খাইনি। ওর গোল গালদুটো শুকিয়ে হাড্ডি বেরিয়ে এসেছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিও কমে গেছে।

হাত দিয়ে পানি খাওয়ালাম ওকে।

"সব ঠিক হয়ে যাবে," মিথ্যে বললাম। "আমাদের কেউ না কেউ উদ্ধার করবেই। আমাকে আর তোমাকে।"

প্রতিটা নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট করতে হচ্ছে আমাকেও। আবারো সবকিছু ঘোলা ঘোলা দেখছি। কোনমতে হামাগুড়ি দিয়ে নদীর তীরে গেলাম।

দুই চোখ বেয়ে পানি পড়ছে।

"কেউ আছেন? সাহায্য করুন আমাদের! খাবার দরকার আমাদের! আর অ্যান্টিবায়োটিক! কেউ শুনতে পাচ্ছেন?" চিৎকার করতে লাগলাম।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। সংখ্যাগুলো নাচতে লাগল আমার চোখের সামনে।

তিনটা আটত্রিশ। তিরিশ মিনিট ধরে চিল্লাচ্ছি আমি।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। এরপর আরো সোয়া মাইল গেলাম তীর ধরে। হাতদুটো গোল করে শুকনো ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলাম।

"কেউ আছেন?"

১১ জুলাই
সূর্যোদয়, ৪:০৫

"ওপিক, ওপিক," ঘাড় ঘুরিয়ে বললাম। উঠে বসতে চাই আমি। ওর ওপর নজর রাখতে চাই, যদিও জানি এতক্ষণে মারা গেছে ও। তবুও না দেখলে তো নিশ্চিত হতে পারব না।

নিশ্চিত হতে পারব না এ ব্যাপারে যে, ওকে বাঁচাতে পারিনি আমি।

শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলা শুরু করলাম, "আমার বাসায় লাল রঙের বড় একটা খাম আছে।"

এটুকু বলে লম্বা একটা শ্বাস নিলাম।

"আমার মা'র ফাইল আছে ওটার ভেতরে। খুব খারাপ খারাপ কাজ করেছেন তিনি। অন্যদের প্রতি, আমার প্রতি। ওনার কারণেই সারাদিনে মাত্র একঘন্টার জন্যে জেগে উঠি আমি। স্লিপ অ্যামপ্লিফিকেশন না কী যেন করেছেন তিনি। নিজের ছেলের সাথে কেউ করে এমনটা? কিন্তু ওটা নিয়ে ভাবিও না আমি। ওপিক? তুমি কি শুনছ ওপিক? আমি মা'র সম্পর্কে সত্যটা জানতে চাই না। আমি যদি খামটা না খুলি তাহলে একটা সম্ভাবনা থেকে যায়, তিনি হয়ত আসলে অতটা খারাপ নন, যতটা ওরা বলেছে। তিনি শুধু আমাদের ফেলে চলে গেছেন।"

"এখান থেকে ফিরতে পারলে তিনটা কাজ করব আমি। ইনগ্রিডকে খুব করে আদর করব। এরপরে বলব, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, আমি খুশি, আমরা বাবা-মা হতে যাচ্ছি। তারপর দোকানে গিয়ে একটা বিড়াল কিনব। একটা পুসি! ল্যাসিকে পাওয়ার আগে আমি জানতামও না, একটা বিড়ালকে এতটা ভালোবাসা যায়। ওর মত আর কেউ নেই! যদিও একটু বদ টাইপের। তা-ও। তোমার কি মনে হয় ওপিক? এসব করার পর কি করব জানো? ঐ খামটা খুলব।

"আমাকে জানতেই হবে, বুঝেছ। জানতে হবে, তিনি আসলেও খারাপ কিনা। আর শুধু ওটাই না। বাবার সম্পর্কেও জানবো। আমার ওপর যখন এক্সপেরিমেন্ট করছিল মা, তখন কোথায় ছিলেন তিনি? বেজমেন্টে? ঐ ফালতু বেজমেন্টটাতে? যেখানে ওনার একেকটা অদ্ভুত রকম শখের জিনিসগুলোর কবর দেয়া হয়! ওখানে কি লুকানো আছে জানো? সারি সারি বাক্স। হয়ত আমার মা'র জিনিসপত্র। একবারে ক্রিসমাসে আমরা, মানে আমি, ল্যাসি আর ইনগ্রিড গেছিলাম ওগুলোর ভেতরে কি আছে দেখতে। ও হ্যা, মারডক ও ছিল। শুনতে পাচ্ছ? ওপিক? কি দেখলাম জানো? বাক্সগুলো গায়েব!

"ওপিক! ব্যাপারটা অদ্ভুত, তাই না? এর পরের দিন প্রায় খুলেই ফেলেছিলাম খামটা। কিন্তু খুলতে পারিনি শেষ পর্যন্ত। যদি আজ পর্যন্ত আমার বাবা সম্পর্কে যা যা জানি ওগুলোও মিথ্যে হয়?"

ওপিকের উত্তর শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু মারা গেছে ও।

ইনগ্রিড।

ল্যাসি।

ওপিক।

সবাই মৃত।

"ওখানে। দেখতে পাচ্ছি!"

"পেয়েছি মনে হয় ওদের। নদীর তীরে, দেখে মনে হচ্ছে দু'জন।"

চোখ খুলে উঠে বসার চেষ্টা করলাম।

একটা আলো এসে পড়ল আমার চোখে।

"হেনরি? কেউ জিজ্ঞেস করল।

পরিত্রাণ!

অধ্যায় ১৬

২০শে জুন
বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

"হেনরি?"

চট করে চোখ খুলে গেল আমার। ঘরটা পুরোপুরি সাদা। আমার ডান হাতের সাথে একটা আইভি নল লাগানো।

"কোথায় আমি?" জিজ্ঞেস করলাম। "এটা কি ফেয়ারব্যাঙ্কসের হাসপাতাল? ওপিক কোথায়? ও কি বেঁচে আছে?"

একজন ডাক্তার ঝুঁকে আছেন আমার ওপর। তার পরণে নীল রঙের অ্যাপ্রন, আর মুখে সাদা মাস্ক।

"ঘুম ভালো হয়েছে আপনার?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিলাম। আমার মাথা ঠিকমত কাজ করছে না, কিন্তু ওটাই স্বাভাবিক। "হ্যা, ভালোই ঘুমিয়েছি। আমাকে উদ্ধার করার জন্যে ধন্যবাদ।"

তিনি ঘাড় বাঁকা করে আয়নার ওপাশে কার দিকে যেন তাকালেন। তার মাস্ক আর মাথার ক্যাপের মধ্যে দিয়ে শুধু কুঁচকানো ভ্রু জোড়া দেখা যাচ্ছে।

"ওপিক আছে এখানে? ইনগ্রিড?"

আমার কথা কানেও তুললেন না তিনি।

এসময় দরজা খুলে কেউ একজন ভেতরে ঢুকল।

কালো স্যুট পরা একজন লোক আমার ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যালো, মি. বিনস।"

"আপনিই কি আমাদের খুঁজে পেয়েছেন নদীতীর থেকে?"

তার প্রতিক্রিয়াও ডাক্তারের মতনই হল। ঘাড় কাত করে ভ্রুজোড়া কুঁচকিয়ে রাখলেন।

"আপনি কি জানেন আজ কত তারিখ, মি. বিনস?"

কিছুক্ষণ ভাবলাম, "জুলাইয়ের বারো তারিখ।"

আবারো একই প্রতিক্রিয়ার পুণরাবৃত্তি।

"ইনগ্রিড কোথায়? ও কি ঠিক আছে?"

ঘুরে চলে গেলেন তিনি।

দীর্ঘ দুই মিনিট পার হল। খেয়াল করে দেখলাম আমার কেবিনটাতে কোন চেয়ার কিংবা টেলিভিশন নেই।

ইন্টারকমে একটা আওয়াজ ভেসে আসল এই সময়, "ইনগ্রিড নিরাপদে আছে।"

"ভূমিকম্পের হাত থেকে বেঁচে গেছে ও?"

একটা দীর্ঘ বিরতি।

"কোন ভূমিকম্প হয়নি," জোরে ইন্টারকম থেকে উত্তর এলো।

"হয়েছে। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারব। নিজের চোখে বিল্ডিংগুলো ভেঙে পড়তে দেখেছি আমি।"

একটা দরজা খুলে গেল। পায়ের আওয়াজ শুনলাম। এবার একজন মহিলা। তার পরনে একটা লম্বা জ্যাকেট। ধূসরাভ চুলগুলো পনিটেইল করে বাঁধা। মুখের ওপর সার্জিক্যাল মাস্ক।

"ফেয়ারব্যাঙ্কসে পৌঁছুনো সম্ভব হয়নি তোমার পক্ষে।"

"হ্যা, আমি পৌঁছেছিলাম।"

"পাইলটরা তোমাকে আমাদের ফ্যাসিলিটিতে নিয়ে এসেছিল, মনে নেই?"

"আপনি পাগল নাকি? আমি ফেয়ারব্যাঙ্কসে গেছিলাম। এরপরে একটা মারাত্মক ভূমিকম্প হয়েছিল। আমি যে ব্রিজের ওপর ছিলাম সেটা ভেঙে নদীতে পড়ে যাই ল্যাসিসহ। এরপরে ওখান থেকে প্রায় একশ মাইল ভেসে আলাস্কার বুনো অঞ্চলে চলে আসি। সেখানেই ছিলাম গত একুশ দিন। বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে।"

"তোমাকে দেখে কেউ বলবে না, আলাস্কার বুনো অঞ্চলে তিন সপ্তাহ কাটিয়েছ।"

আমার হাতের দিকে তাকালাম, ওগুলো দেখে মনে হচ্ছে না, একটা মশাও ছুয়েছে আমাকে গত একুশদিনে। পরনের গাউনটা বুক পর্যন্ত খুলে ভিতরে তাকালাম। আশা করছিলাম হাড্ডিসার পাঁজর চোখে পড়বে। কিন্তু ওরকম কিছু দেখলাম না। সব স্বাভাবিক। গালে হাত দিলাম। লম্বা দাড়ি নেই। তার বদলে দু-দিনের না কামানো চাপদাড়ি অনুভব করলাম।

"কি হচ্ছে এসব?"

"কতদিন আলাস্কায় ছিলে তুমি?"

এত কিছুর মাঝে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা কঠিন। বুনো অঞ্চলে ছিলাম একুশ দিন, তার সাথে ভূমিকম্পের আগের দু-দিন। "তেইশ দিন।"

"এর মাঝে কত ঘন্টা জেগে ছিলে তুমি?"

"তেইশ ঘন্টা," ঢোক গিলে বললাম।

মহিলাটা মাথা নেড়ে বলল, "তেইশ ঘন্টা আগে প্লেনে চড়ে ফেয়ারব্যাঙ্কসের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলে তুমি। কিন্তু প্লেনটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।"

মেরুদণ্ড বরাবর ঠাণ্ডা একটা স্রোত প্রবাহিত হল।

"মানে? কেন? ইনগ্রিড কোথায়? আর এখানে মানে, কোন্ জায়গা?"

"ইনগ্রিড নিরাপদে আছে। বিড়ালটাও। তাদের মৃদু চেতনানাশক দিয়ে প্লেন ছাড়ার আগে গাড়িতে তুলে দেয়া হয়েছিল।"

মৃদু চেতনানাশক? গাড়িতে তুলে দেয়া হয়েছিল?

"আচ্ছা! কিন্তু আমি এখানে কি করছি?" জিজ্ঞেস করলাম। "কোথায় এটা?"

গাঢ় সবুজ চোখের মহিলা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। জ্বলজ্বল করছে চোখদুটো।

"এটা হচ্ছে সর্বাধুনিক জিজ্ঞাসাবাদের কেন্দ্রস্থল!"

সবকিছু পরিস্কার হয়ে গেল।

গত তেইশ ঘন্টা ঘুমিয়েছি আমি।

আর আমাকে নির্যাতন করা হচ্ছিল।

আমার নিজের মস্তিষ্ককে ব্যবহার করে নির্যাতন।

আগের কথা ভাবলাম।

একটা সাদা ঘর।

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত একজন ডাক্তার।

আমার বাহুতে একটা আইভি লাগানো।

কোথায় ওটা?

আমি জানি না।

কোথায় ওটা?

কি কোথায়?

ফ্ল্যাশড্রাইভভটা।

কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভভ?

গোলাপি রঙের তরলে ভরা একটা সিরিঞ্জ।

আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করলাম।

আইভি নলের মধ্যে সিরিঞ্জটা ঢুকিয়ে চাপ দিল লোকটা।

আমি চিৎকার করে উঠলাম।

ওটা স্বপ্ন ছিল না মোটেও, বাস্তবে ঘটেছে। বাকি সবকিছু, কেবিন, সূর্যোদয়, প্রেগন্যান্সি, ভূমিকম্প, নদী, ক্যানো, বল্গা হরিণ, ওপিক, ভাল্লুক, রাগ, ক্ষুধা, যন্ত্রনা, মৃত্যু ওসবই...কল্পনা।

"কি ইনজেক্ট করা হয়েছিল আমাকে?"

"আমাদের গত চল্লিশ বছরের গবেষণার ফসল।"

"দুঃস্বপ্ন দেখতে বাধ্য করে ওটা?"

"অনেকটা ওরকমই।"

দীর্ঘক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। জানে, আমার মাথায় কি চলছে। "দুঃস্বপ্নটা আমরা তৈরি করি না। আমাদের কাজ শুধু ঘুমের মধ্যে কিছু ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করা। বাকিটা কাজ সাবজেক্টের মস্তিষ্কই করে।"

ভূমিকম্পের পরিসংখ্যান, এস্কিমো-ইন্ডিয়ান অলিম্পিক, বল্গা হরিণ, ভাল্লুক, এসবই ইন্টারনেটে দেখেছিলাম আমি। ইনগ্রিডের প্রেগন্যান্ট হওয়া, ল্যাসির অসুস্থ হয়ে পড়া, ওপিকের মৃত্যু, বাবার সম্পর্কে ভুল জানা–এসব হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় ভয়গুলো।

আমি নিজেই ঐ পৃথিবীটা তৈরি করেছিলাম।

মুখের সার্জিক্যাল মাস্কটা নামিয়ে ফেলল মহিলা।

ডানদিকে রাখা আমার হার্ট-রেট মনিটরটা তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠল।

শব্দ করে ঢোক গিললাম।

"সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামে স্বাগতম," আমার মা বললেন। "অনেক দিন পরে এখানে আগমন ঘটল তোমার।"

3:21 AM

নীল অ্যাপ্রন পরিহিত ডাক্তারটা ফেরত এলো এ সময়।

"আমি আবার জিজ্ঞেস করছি," মা বললেন। "ফ্ল্যাশড্রাইভটা কোথায়?"

"কিসের ফ্ল্যাশড্রাইভ? আমি জানি না কিসের কথা বলছেন আপনারা।"

"ফ্ল্যাশড্রাইভটার কথা," এই বলে থামলেন তিনি।

ডাক্তার একটা সিরিঞ্জ তুলে ধরল।

"প্রেসিডেন্ট যেটা দিয়েছে তোমাকে।"

শেষ

লেখকের কথা :
বাংলাবুক'স ডিরেক্ট লিঙ্ক

আমি জানি আপনাদের অনেকেই হয়ত এতক্ষণে বইটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কিংবা কুটি কুটি করে ছেঁড়ার কথা ভাবছেন। আশা করি ঐ ভাবনা পর্যন্তই, পরের কাজটা আর করেননি। একটা জিনিস জেনে অবাক হবেন, এই বইয়ের বেশিরভাগ ঘটনাই বাস্তবসম্মত। আলাস্কার সূর্যোদয়ের সময়গুলো আসল, আর সত্যিই আমেরিকার ৫০% ভূমিকম্প আলাস্কাতেই হয়।

আলাস্কাতে বল্গা হরিণ, বাদামি ভাল্লুক আর মেরু শিয়াল (আর্কটিক ফক্স)-এর বসবাস।

সব বেরি ফল আর বাদামের কথাগুলোও সত্যি।

২১ দিন অল্প খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব। *ন্যাকেড অ্যান্ড আফ্রেইড* দেখতে পারেন প্রমাণস্বরূপ।

আর এস্কিমোদের সম্পর্কে বেশিরভাগ কথাবার্তাই সত্যি। বেশিরভাগ।

নদীগুলোর বর্ণণাও সঠিক আশা করি।

ইন্ডিয়ান-এস্কিমো অলিম্পিক প্রতি বছর ফেয়ারব্যাঙ্কসে সংঘটিত হয়। আর অদ্ভুত অদ্ভুত খেলাগুলো আসলেও খেলে লোকজন।

সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অংশটুকু নেয়া হয়েছে একসময়কার সিআইএ'র টপ সিক্রেট প্রজেক্ট MKUltra থেকে। উইকিপিডিয়ায় খোঁজ নিতে পারেন।

হেনরির মা আর সিআইএ'র স্লিপ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের বড় একটা ভূমিকা থাকছে আগামি বইতে। এখন দ্রুত সেই বইটা পড়ে ফেলুন। ওটা পড়লেই এটার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন।

ধন্যবাদ সবাইকে।

নিক পিরোগ
ডিসেম্বর ১, ২০১৪